শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৫ আগস্ট, ১৯৫৬

বর্ষ—১৬ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিক।

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৩)

COMPLIMENTARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা ১২

১। মায়ের প্রার্থনা
২। মানস-সরোবরের অরবিন্দ — ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
৩। প্রশ্নোপনিষদ — শ্রীঅরবিন্দ
৪। দিব্য-জীবন — অনির্বাণ
৫। উর্বশী — শ্রীঅরবিন্দ
৬। কবি শ্রীঅরবিন্দ — শ্রীসুকুমার সেন
৭। বিবর্তন-ইতিহাসে এক অধ্যায় — শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
৮। যৌথ অবদান
৯। আশ্রম-বালকবালিকাদের প্রতি — শ্রীমা
১০। "ভালোবাসি সূর্যের কিরণ", (কবিতা) — দাদলবরণ

মূল্য—২৲ টাকা

541-'56-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

1956

29 février - 29 mars
Seigneur, Tu as voulu et je veillerai
Une lumière nouvelle point sur la terre,
Un monde nouveau est né,
Et les choses promises sont accomplies

29 February - 29 March
Lord, Thou hast willed, and I execute
A new light breaks upon the earth,
A new world is born.
The things that were promised are fulfilled

ভগবান, তোমার আদেশ হয়েছে, আমি তা পালন করে চলেছি—
নূতন এক আলো ফুটে উঠলো পৃথিবীর উপর,
নূতন এক জগৎ জন্মগ্রহণ করল,
যা-সব আশার কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ করা হল।

মায়ের প্রার্থনা

জানুয়ারী ২, ১৯১৫

যে কোন ভাবনা, যতই সরল হোক, গভীর হোক, বারবার যদি তার পুনরাবৃত্তি করা হয়, নিরন্তরই যদি তার পুনরুক্তি করা হয়, তবে তা হয়ে পড়ে প্রাণহীন স্বাদহীন মূল্যহীন। উচ্চতম ধারণা পর্য্যন্ত এইভাবে কালক্রমে বিশুষ্ক হয়ে যায় : যে বুদ্ধি অভ্যস্ত ছিল তুরীয় বিচারে মগ্ন থাকতে, হঠাৎ সে অনুভব করে একটা দুর্ব্বার প্রয়োজন সকল যুক্তি সকল তত্ত্বজ্ঞান তার বিসর্জ্জন দিতে—শিশুর মত বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে, অতীতের তার যাবতীয় বিজ্ঞতা ভুলে যেতে, হোক না তা পরম দৈবী বিজ্ঞতা।

একথা সত্য, কালের বিভাগ একেবারেই কৃত্রিম ; নববৎসরের যে প্রথম দিনটি ধার্য্য করা হয় তা দেশের অক্ষাংশ, জলবায়ু এবং রীতিনীতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়—তা একান্তই সংস্কার মাত্র। কিন্তু এ হল মনের সেই ভাব যা মানুষের অপোগণ্ডতা দেখে হাস্য করে, যা চায় গভীরতর সত্যের দ্বারা চালিত হতে। তবে সেই মনই আবার হঠাৎ নিজের অক্ষমতা অনুভব করে যে, সব সত্য যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা তার সাধ্যায়ত্ত নয় : এ ধরণের বিজ্ঞতা তাই সে আবার পরিহার করে, যাতে হৃদয় থেকে উঠতে পারে অভীপ্সার গান—কারণ হৃদয়ের কাছে সবরকম অবস্থাই হল গভীরতর বৃহত্তর তীব্রতর অভীপ্সার সুযোগ।.....পাশ্চাত্যের নববর্ষ এসেছে, সে-সুযোগ গ্রহণ কর না কেন সঙ্কল্পকে বাগ্রতর করে তুলবার জন্যে, যাতে এই প্রতীকটি বাস্তব হয়ে ওঠে, যাতে দৈন্যগ্রস্ত জিনিষ সব ছিল যত তার পরিবর্ত্তে এসে দেখা দেয় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সব জিনিষ।

আমাদের বিশ্বাস তোমার সংজ্ঞা একটা আমরা নির্দ্ধারণ করতে পারি, মানস সূত্রাবলির মধ্যে তোমাকে বেঁধে দিতে পারি—কিন্তু সে-সব যত বহুমুখী বা ব্যাপক হোক না, চিরকাল তুমি অনির্ব্বাচ্য রয়ে যাবে, এমন কি যে তোমাকে জানে ও তোমার মধ্যে বাস করে তার কাছে পর্য্যন্ত। কারণ, তোমাতে বাস করা যায়, তোমাকে কথায় ব্যক্ত করতে না পারলেও, তোমার আনন্দ্য হয়ে ওঠা যায়, উপলব্ধি করা যায়, তোমার বিবৃতি দিতে ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও। তুমি চিরকাল চিরন্তন রহস্য রয়ে যাবে, আমাদের পরম বিস্ময়ের বিষয় হয়ে—তোমার যে অজ্ঞেয় বিশ্বাতীত সত্তা সে-দিক দিয়ে শুধু নয়, তোমার যে বিশ্বভূত প্রকাশ, যে সার্ব্বভৌম সত্তা ধরে আমরা যা-কিছু হয়েছি সে-ভাবেও। আমাদের চিন্তাগত রূপাবলি পরম্পরায় চলবে, ক্রমে তারা শুদ্ধতর উন্নততর ব্যাপকতর হয়ে উঠবে নিশ্চয়, কিন্তু কখন তারা এমন কিছু

হয়ে উঠবে না, যখন বলা যেতে পারে যে তুমি কে সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার মত তাদের সামর্থ্য হয়েছে। প্রত্যেক নূতন ঘটনা, নূতন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো আশ্চর্য্যকর রহস্যজনক হয়ে দেখা দেবে। তবু নিজের এতখানি অজ্ঞতা এতখানি অক্ষমতা দেখেও মানসসত্তা রয়েছে প্রসন্ন প্রশান্ত, যেন তার লাভ হয়ে গিয়েছে পরম জ্ঞান—সেই জ্ঞান যার অর্থ তুমি হয়ে-যাওয়া, বহুলভাবে অনন্যভাবে অনন্তভাবে একান্ত সহজভাবে।

জানুয়ারী ১২, ১৯১৫

মানস-সত্তায় আপূর্ণতা—সদা-সর্ব্বদা যেমন, তবে আরো বেশি করে যেন এখন—উঠে চলেছে তোমার দিকে বিপুল আগ্রহে.....অসীমের ও শাশ্বতের উপলব্ধি তেমন রয়েছে সমানে। কিন্তু সকল ভাগবত তন্ময়তা, সকল আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ থেকে তুমি যেন আমাকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছ, একান্ত নিবিড় জড়-অবস্থারই মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ভগবান, তোমার অখণ্ড আনন্দ যে সর্ব্বত্র—আর তুমি যে বহৎ বস্তু আমাকে দান করেছ তা ত কিছুরই সাধ্য নাই যে আমার কাছে থেকে ফিরিয়ে নেয়; সকল স্থানে সকল অবস্থায় তা রয়েছে আমার সঙ্গে—কারণ, সে যে আমিই, যেমন আমি হলেম তুমিই। কিন্তু যা হতে হবে তার তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। তুমি চাও, এই ভারাক্রান্ত তমসাগ্রস্ত জড়ের ভিতর থেকে আমি উৎসারিত করে ধরি তোমার প্রেমের তোমার জ্যোতির আগ্নেয়স্রাব; তুমি চাও, প্রকাশের সব রকম প্রাচীন বিধি-বিধান ভেঙ্গে দিয়ে উদিত হয় এমন বাক্ যা তোমাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম, যা কখন কেউ শোনে নি; তুমি চাও, অখণ্ড মিলন সাধিত হোক, নীচের সব চেয়ে তুচ্ছতম বস্তুর আর ঊর্দ্ধের সবচেয়ে বৃহত্তম বস্তুর মধ্যে। তাই ত ভগবান, সকল তন্ময়তা, সকল আনন্দ, আধ্যাত্মিক সকল ভাবাবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, সকল স্বাতন্ত্র্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে আমি অনন্যভাবে তোমাতেই একাগ্র হয়েছি। তুমি ত বলেছ আমায়: "সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ হয়ে কাজ করে চল তুমি; এই বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যে তাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুমাত্র তুমি নও—এই শিক্ষা লাভ কর তোমার জীবনধারায়; তাদের জীবনধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে নিজেকে মিলিয়ে ধর। কারণ, তারা যতটুকু জানে, যতটুকু হয়ে আছে, সে-সব ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে তুমি বহন করছ চির-ভাস্বর, অবিকম্পিত অগ্নি-শিখা—তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ধরে, এই শিখাকেই তুমি নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে। তুমি যদি বিচ্ছুরণ কর আলো, তবে তা উপভোগ করবার প্রয়োজন আছে কি তোমার? আমার প্রেম যদি তুমি বিতরণ করে চল, তবে প্রয়োজন আছে কি তোমার অন্তরে তুমি অনুভব করবে তার স্পন্দন? তাদের সকলের জন্যে তুমি হবে আমাতে-নিহিত আনন্দের বাহক, তবে কি প্রয়োজন তোমার তাকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করবার?"

সর্ব্বতোভাবে, ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!
তোমার ইচ্ছাই আমার সুখ, আমার বিধি-বিধান।

জানুয়ারী ১৭, ১৯১৫

ভগবান, সব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। বিশ্রামের আর প্রস্তুতির সময় চলে গেল। তুমি চাইলে, নিষ্ক্রিয় ধ্যানপর সেবক আর না থেকে, হয়ে উঠি তোমার সক্রিয় সিদ্ধিকর সেবক; তুমি চাইলে, যা ছিল শুধু সতৃপ্ত স্বীকৃতি তা এখন হয়ে উঠুক সোল্লাস সংগ্রাম; বর্ত্তমানে যতখানি সম্ভব তোমার বিধান বিশুদ্ধ ও সমূর্দ্ধ মূর্ত্তি গ্রহণ করতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যা-কিছু সে-সকলের সঙ্গে আমি যেন নিরন্তর বীরের মত লড়াই করে চলি, আর তারই মধ্যে পাই যেন সেই একই প্রশান্ত অটল সাম্য যা লাভ হয় যখন আমরা বর্ত্তমানের চলিত বিধান মেনে চলি, অর্থাৎ তোমার বিধানের বিরুদ্ধে যা-কিছু তার সঙ্গে সাক্ষাৎযুদ্ধ না করে, যদি শুধু চাই সব রকম ঘটনার মধ্যে থেকেই যতখানি ভাল যা সম্ভব তা আবিষ্কার করা, কাজ করে যাওয়া ধীর সঞ্চার, উদাহরণ ও সংক্রমণের ফলে।

একটা আংশিক সীমাবদ্ধ সংগ্রাম, যা হল পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংগ্রামের প্রতিভূ, তার ভিতর দিয়ে তুমি আমার সামর্থ্য, আমার তৎপরতা, আমার সাহস পরীক্ষা কর, দেখতে চাও সত্যসত্যই আমি তোমার সেবক হতে পারি কি না। যদি যুদ্ধের ফল দেখায় যে তোমার বিশ্ব-পাবন কর্ম্মের যন্ত্র হবার উপযুক্ত আমি, তা হলে কর্ম্মের ক্ষেত্র তুমি আরো প্রসারিত করবে। আর আমার নিকটে তুমি যা আশা কর তত দূর পর্য্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারি, তা হলে একদিন আসবে, ভগবান, যখন তুমি এই পৃথিবীর উপর নেমে আসবে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তখন তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তুমি কিন্তু পৃথিবীকে দুবাহুতে আলিঙ্গন করবে, পৃথিবী লাভ করবে রূপান্তর।

জানুয়ারী ১৮, ১৯১৫

ভগবান, শোন আমার প্রার্থনা—

আমার মধ্যে তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আমার ভাগ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, আমার জীবনের দিশারী, সকল বিঘ্নবিনাশক, মনের যাবতীয় পূর্ব্ব-সংস্কার ও পক্ষপাতিত্বের ধ্বংস-সাধক। তবে বাহিরেও সর্ব্বশক্তিমান হয়ে উঠবার জন্য তোমার প্রয়োজন যন্ত্রহিসাবে আমার মন হয় যেন সংগঠনক্ষম, হয় যেন কর্ম্মপন্থার নির্ম্মাতা। কিন্তু তুমিই তোমার যন্ত্রকে নিখুঁৎ করে তুলতে পার; তোমার ব্রত যে পূর্ণ হবে, তাতে সন্দেহ কি আছে? বিপরীত সন্দেহকে তুলে ধরে যত অপচ্ছায়া তাদের দূর করে দিতে হবে তোমার অসীম করুণার উপর অটল নির্ভর পূর্ণভাবে রেখে, তোমার কাছে নিবেদন করি এই আমার প্রার্থনা—

শত্রুকে মিত্ররূপে পরিণত কর
অন্ধকারকে আলোকে পরিবর্ত্তিত কর।

প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের, তোমার বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই যে দুঃসাহসিক সংগ্রাম তার মধ্যে আমি যেন এক মহত্তর শান্তির জন্য মানবজাতিকে উপযুক্ত করে তুলতে পারি—যখন মানুষে মানুষে আজকলহ সব থেমে গিয়েছে, যখন মানুষী প্রয়াস সমগ্রভাবে নিযুক্ত হতে পারে তোমার ইচ্ছাকে ক্রমে মহত্তর সমগ্রতর করে তোলবার জন্যে, তোমার লক্ষ্যের ক্রমবিকাশের জন্যে।

২৪ জানুয়ারী, ১৯১৫

ভগবান, তোমার সম্মুখে আমি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে ছিলাম—অন্তরে নিজেকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে, অলস আরাধনায় পূর্ণ হয়ে, পরম একান্ততার জন্যে উন্মুখী হয়ে। চিরদিন যেমন তুমি আমায় বলছ : "পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর।" আমি দেখলাম পথ সব উদার উন্মুক্ত, প্রশান্ত বিশুদ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত।

মুক আরাধনায় মগ্ন হয়ে, তোমার ইচ্ছাতে ওতপ্রোত হয়ে, আমি পৃথিবীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেম—

ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯১৫

সত্যরূপী ভগবান। বারবার তিন বার আমি তোমায় ডেকেছি—বিপুল ব্যাকুলতা নিয়ে, তোমার প্রকাশের জন্য বিনতি করে।

তারপর সমগ্র সত্তা তার অভ্যাসমত তোমার কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে দিল। তখন দেখতে পেল তার বাষ্টিগত মনোময় প্রাণময় অন্নময় সত্তা ধূলায় যেন আবৃত হয়ে আছে ; তাই তোমার সম্মুখে আপ্রণত হয়ে, মাটিতে মাথা হেঁকিয়ে বললে : "ভগবান, ধূলি-গঠিত এই আধার তোমার কাছে আপ্রণত, তার প্রার্থনা সে যেন সত্যের আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তোমাকে ছাড়া আর কিছু যেন প্রকাশ না করে…।" তুমি তখন তাকে বললে : "উঠে দাঁড়াও, সকল ধূলি হতে মুক্ত শুদ্ধ তুমি"। চক্ষের নিমেষে হঠাৎ সকল ধূলি ঝরে গেল মাটিতে, গায়ের বস্ত্র খসে পড়ে যেমন—আধার দেখা দিল সমুন্নত, তবু তেমন বস্তুময় অথচ প্রখর জ্যোতির্ময়।

মানস-সরোবরের অরবিন্দ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'অনল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল। এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে পাঁদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে। নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার! কেবল বর্ণ-বিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞ অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর!! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ-দুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী! বৃহৎ ও মহৎ। ছন্দের প্রসাদতায় বৃহৎ। হিন্দুর স্বধর্ম্ম মহিমায় মহৎ!! এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল-পর্ণের ন্যায় কান্ত-পেলব এহেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না! দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গীর সভ্যতার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের ছেলে-অরবিন্দ "বন্দে মাতরম" পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।

তোমরা ঐ ন্যাপথেপে, প্যানপেনে ফিরিঙ্গীর পো-ধরা নভেলগুলা আর ছুঁইও না। ঐ অরবিন্দ ভাববিন্যাস বুকে স্বদেশপ্রীতির বাণ ডাকাইয়া দিবে! মাতৃসেবার উত্তেজনা যোগাইবে। "বন্দেমাতরমের" কথা শুনিলে ভয় ঘুচিবে। বাহুতে বজ্রবল আসিবে। শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বহিবে। আর মরণকে মনে হইবে বসন্ত-বিলাস। সাপের ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া যেমন বিষ ঝাড়ায়, বন্দে মাতরমের মন্ত্রে তেমনি ফিরিঙ্গীয়ানার বিষ-জর্জ্জরতা ঘুচিয়া যাইবে। বুঝিবে, ঐ কামান বন্দুক, ঐ জেল কারাগার, ঐ আইন আদালত, ঐ লাট বেলাট সব ফক্কিকার!! ফিরিঙ্গীর হুড়ুম দুড়ুম দুদিনেই অজা পাইবে।

বিলেতে লেখাপড়া শিখিলেও বিলেতী অবিদ্যার পুতনা মায়া অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অরবিন্দ শরতের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আপনার স্বদেশের স্বধর্ম্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া জননী-জন্মভূমি শ্রীচরণ পদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্যের মত শোভা পাইতেছেন। আহাঃ! এমন কি আর হয়? অরবিন্দ ফিরিঙ্গীর আঁস্তাকুড়ের বাবু নহেন। তাই তিনি খাঁটি মায়ের ছেলে হইয়া ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐখানে বন্দে মাতরম মন্ত্রে মাকে প্রণাম কর। স্বরাজ প্রাতষ্ঠার আর বিলম্ব নাই।*

---

* প্রাচীন "সন্ধ্যা" পত্রিকা হইতে গৃহীত।

প্রশ্নোপনিষদ

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ পরমাত্মাকে প্রণাম। হরি ওঁ। পরমপুরুষই ওঁ।

১। ভরদ্বাজগোত্রীয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সূর্য্যবংশীয় গার্গ্য, কোসলদেশীয় অশ্বলের পুত্র, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কবন্ধী কাত্যায়ন—এরা কজন একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে পরম ব্রহ্মের অন্বেষণে রত ছিল*। তারা মনে করল, "ভগবান পিপ্পলাদ† আমাদের সেই সর্বনাশের বিষয় বলবেন"; সুতরাং তারা সমিৎ হাতে নিয়ে শিষ্যভাবে মহর্ষির কাছে উপস্থিত হল।

২। মহর্ষি পিপ্পলাদ তাদের বললেন, "আত্মসংযম ক'রে, পবিত্রভাবে ও বিশ্বাস নিয়ে একবছর তোমরা এখানে বাস কর, তারপর যথেচ্ছ প্রশ্ন ক'রো, যদি জানি, সব কথা অবশ্যই তোমাদের বলব।"

৩। বৎসরান্তে কবন্ধী কাত্যায়ন তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল, "ভগবন, এই সব জীব জন্মে কোথা থেকে?"

---

* উপনিষদের যুগে দেশব্যাপী ভাগবত প্রেরণার আগুন জ্বলেছিল। এই হল তার একটা উদাহরণ; অন্যান্য উপনিষদেও আছে আরও অনেক;—ঋষিরা তপোবনে তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সাধনের পরীক্ষা ক'রে যথাযোগ্য উপদেশ দিচ্ছেন; রাজপুত্র, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সমৃদ্ধ গৃহস্থ, এমন কি দাসীপুত্রও দেশময় ঘুরে খুঁজছে কোথায় পাবে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, কার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে; সাধনার বহু আশ্রম রয়েছে; রাজারাও আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করছেন আর তাঁদের সভায় ব্রাহ্মণেরাও শিষ্য রূপে জ্ঞানের সন্ধানে আসছেন; যজ্ঞসভায় ঋষিরা সমবেত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির তুলনা করছেন। তার ফলেই, ভারতের সংস্কৃতি দর্শন ও সাধনার এই অপূর্ব ভিত্তি প্রস্তুত হতে পেরেছে। (Foundations of Indian Culture. পৃ ৩১৬)।

† অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখা এখনও প্রচলিত আছে, যদিও শৌনক শাখাই বেশী চলে। ব্যাসশিষ্য সুমন্ত অথর্ববেদ সংকলনের ভারপ্রাপ্ত হন, তাঁর প্রশিষ্যের শিষ্য হলেন পিপ্পলাদ। অনুমান, মহাভারত যুদ্ধের একশ বছর পরে।

৪। তিনি বললেন তাকে, "পরম পিতার সন্তাননাভের ইচ্ছা হল, তিনি তাঁর চেতনার তেজ উদ্দীপ্ত করলেন,* সে উত্তাপে এক মিথুন উৎপন্ন হল, রয়ি ও প্রাণ†। বললেন তিনি, 'এই মিথুন আমার জন্য নানা প্রকৃতির সন্তান উৎপাদন করবে।'

৫। "অবশ্য, সূর্য্যই প্রাণ, চন্দ্রই রয়ি,‡ অথবা এই বিশ্বে সাকার নিরাকার সবই রয়ি, সুতরাং আকার ও জড় এক, মূর্তিই রয়ি।

৬। "সূর্য উদিত হয়ে পূর্বদিকে প্রবেশ ক'রে সেদিকের সব প্রাণবায়ু নিজের রশ্মির মধ্যে শোষণ করে; দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, ঊর্ধ্ব, অন্তরিক্ষ,—সব দিক প্রকাশিত ক'রে প্রত্যেক দিকের প্রাণবায়ু নিজের রশ্মি সবে আকর্ষণ ক'রে নেয়।

৭। "সুতরাং সে-ই এই ঊদীয়মান অগ্নি, এই বিশ্বময় মানব, সব বিশ্ব তারই রূপ, সেই প্রাণ। ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে,—

৮। "'বিশ্বরূপ জ্যোতির্ময় সূর্যই অগ্নি, তিনি সর্বজনমন্ত্র, পরম অধ্যাত্মধাম, একমাত্র প্রজ্বলিত জ্যোতি। তিনি সহস্ররশ্মি, সর্বভূতের অন্তরে শতভাবে বর্তমান; সেই সব প্রাণীর প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত।'

৯। "সংবৎসরই প্রজাপতি‡‡; তার দুই পথ, উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন। ইষ্টাপূর্তকে কর্তব্য মনে ক'রে তার দ্বারা যারা ভগবানের অর্চনা করে তারা চন্দ্রলোক জয় করে, আবার জন্ম নিয়ে তারা সংসারে ফিরে আসে। সুতরাং যেসব ঋষিদের সন্তান কামনা আছে তারা দক্ষিণ অয়ন গ্রহণ করে, পিতৃগণের যেপথ; সেই হল 'রয়ি'।

---

* ঋগ্বেদেও একথা আছে, যথা "অতীক্ষাংতপসোঽধ্যজায়ত," ১০।১৯০।১

† 'রয়ি' জড়, স্ত্রীলিঙ্গ, উপাদান ও ক্ষেত্র; 'প্রাণ', পুংলিঙ্গ, তেজের বিগ্রহ; শক্তির প্রয়োগ ও গ্রহণের, সক্রিয় প্রীতি ও নিষ্ক্রিয় আকরের মিথুন।

‡ সূর্য পরম জ্ঞানের আলোক ও তেজের প্রতীক, চন্দ্র মনের; একত্বপ্রতীতি বিভেদাত্মক মনোময় বোধে প্রতিফলিত হয়ে হয় অজ্ঞান জগৎ সৃষ্টির সূত্রপাত। জড়জগতেরও সূর্যই প্রাণ; আর সোম থেকে হয় পর্জন্য, তা থেকে ওষধী, বলে উপনিষদে।

‡‡ কাল হল আভ্যন্তরীণ বা বিষয়ীগত ব্যাপ্তি, **subjective extension,** ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার অনুভবের মধ্যে যে ব্যবধান বা অবকাশ। বিশ্ব অভিব্যক্তির এই হল প্রথম আশ্রয়, মানুষের পক্ষে বিশ্বকে বুঝবারও মৌলিক অবলম্বন।

জগতের ক্রমপ্রকাশে একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে, উদ্‌ঘাটনের একটা কালচক্র আছে, সেই হল সংবৎসর; সব সৃষ্টি তার অধীন, সেও প্রজাপতি। ঋগ্বেদেও তার নির্দেশ আছে, (১০।১৯০) নিশ্চেতনের 'রাত্রি' থেকে এল 'সমুদ্র অর্ণব', কর্মপ্রবৃত্ত চেতনার প্রবাহ, তা

১০। "আর উত্তরায়ণের পথে যায় যে সব জীব আত্মসংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, বিশ্বাস ও জ্ঞানের সঙ্গে পরমাত্মার সন্ধান করে, তারা আদিত্যলোক জয় করে ; সেই হল প্রাণবায়ুর বিরামের ধাম, অমরত্ব সেখানে ভয়হীন, আত্মার সেই পরমগতি, উচ্চতম স্বর্গ, সেখান থেকে জীবের আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না ; অতএব সে হল একটা নিরোধ।* এবিষয়ে এই শ্লোক আছে,—

১১। "'কেহ বলে, পরমপিতার পঞ্চ পাদ বা অংশ ও দ্বাদশ বিগ্রহ এবং তিনি স্বর্গের ওপারে, উর্ধ্বতর গোলার্ধে প্রবাহিত হন ; অন্যেরা আবার বলে যে তিনি বিচক্ষণ, প্রজ্ঞারূপী, তাঁর রথে সাত চাকা এবং প্রত্যেক চাকায় দুটি ক'রে আরা।'†

থেকে সংবৎসর। তাতেও আছে 'অহোরাত্রি', আলো আঁধারির বিধুন, কর্ম ও বিরাম, আহরণ ও আত্তীকরণের যুগল ভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ণ পরিণতি।

* সেখানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রাণকে অবিরাম জন্মমৃত্যুর মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। এ যেন প্রাকারবেষ্টিত নগরী, সবাই সেখানে যেতে পায় না, যারা যেতে পায় তারা নিরাপদ।

এই দেবযান ও পিতৃযান। শুক্লকৃষ্ণ গতির কথা গীতাতেও আছে, মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে।

† দীর্ঘতমা ঋষির শ্লোক এটি, ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।১২। যাস্ক ও সায়ন বাহ্য অর্থ নিয়েছেন, বছরে কেহ বলে, পাঁচ ঋতু, কেহ বলে ছয়। কিন্তু রথের সাত চাকা ? আর, এ প্রসঙ্গে এ-শ্লোক উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন ?

বেদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে সঙ্কেত শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তাতে এর চমৎকার প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা হয়। বেদের ঋষিরা বিশ্বকে দেখতেন স্তরে স্তরে সাজান সব লোক দিয়ে তৈরি পরম ব্যোমে আরোহণের সোপান বলে। তার শীর্ষে হল বিষ্ণুর পরমপদ, সচ্চিদানন্দ লোক, মানব প্রগতির চরম লক্ষ্য ; সেখানে অস্তিত্ব হল পরাচেতনার জ্ঞান ও শক্তির প্রবাহ সব ; তাতে একত্ব ও বহুত্ব, ব্যষ্টিভাব ও সর্বময়ত্ব যুগপৎ স্বতঃসিদ্ধ, অমরত্ব ও দিব্য আনন্দে নির্ভয়ে বিরাজিত। নীচে হল দেহ-প্রাণ-মনের অজ্ঞাননয় লোক তিনটি, 'ভূর্ভুবস্বঃ'। মাঝে রয়েছে এ দুয়ের সংযোগের সেতু, দ্যৌ বা সূর্যলোক, 'মহঃ'। (On the Veda পৃ ৪২৫-২৭)

প্রথম শ্লোকার্ধে বলা হল এই উর্ধতম লোকের কথা, 'পরে অর্ধে'। সেখানে পরমপিতা 'পুরীষী' বা প্রবহমান ('পৃ', বহু,+'ইষ্' গতি) পূর্বে উদ্ধৃত ১।১৯০ সূক্তে যাকে বলা হয়েছে 'সমুদ্র অর্ণব'। ক্রমপরিণতির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা সেখানে সংসিদ্ধ হয়েছে, তাই পিতার 'দ্বাদশাকৃতি', বহুবিভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপায়ণ। দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় সত্তা পূর্ণ বিকশিত, তাই পিতা 'পঞ্চ পাদ'।

দ্বিতীয় শ্লোকার্ধে বলা হল অজ্ঞান জগতের কথা। সেখানে জীবের উদ্দেশ্য হল

১২। "মাসই প্রজাপতি, তার কৃষ্ণপক্ষ হল রয়ি, শুক্লপক্ষ প্রাণ। তাই ঋষিরা যজ্ঞ করে কেহ বা শুক্লপক্ষে, কেহ বা কৃষ্ণপক্ষে।

১৩। "দিবারাত্রিই প্রজাপতি, তার দিন হল প্রাণ, রাত্রি রয়ি। দিনে যারা স্ত্রীসম্ভোগ করে তারা তাদের প্রাণের প্রতি অন্যায়াচরণ করে আর রাত্রে সম্ভোগ ব্রহ্মচর্যই।

১৪। "অন্নই প্রজাপতি, অন্ন থেকে জাত হয় রেতঃ, আর তা থেকে উৎপন্ন হয় এই সব প্রাণী।

১৫। "সুতরাং যারা সেই প্রজাপতি ব্রত পালন করে তারা এই নিখুন উৎপাদন করে। কিন্তু সেই ব্রহ্মলোক তাদেরই যাদের স্বভাবে আত্মসংযম ও পবিত্রতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সত্য যাদের মধ্যে চিরতরে আসনলাভ করেছে।

১৬। "তাদেরই সেই নির্মল ব্রহ্মলোক যাদের মধ্যে কুটিলতা বা অসত্যের স্থান নাই, মায়া বা মতিভ্রম নাই।"*

উর্ধ্বগতি, অশ্বরূপ যজ্ঞ (On the Veda পৃ৪৩২)। তাই পিতা রথে অর্পিত; 'বিচক্ষণ' বা সর্বদর্শী তিনি ক্রমপরিণতি নিয়ন্ত্রিত করেন। সে রথের সাত চাকা, অস্তিত্বের সপ্ততত্ত্ব, দেহ-প্রাণাদি। প্রত্যেক চাকার আকার ঠিক রাখে ছয় আরা বা শলাকা। যজ্ঞের আছে নির্দিষ্ট বিধি, প্রত্যেক দেবতার নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগ—সাধনার সব ক্রিয়া ঠিকমত ব্যবস্থিত করতে হবে যাতে সব চিত্তবৃত্তির উপযুক্ত পরিণতি হয়; অনুষ্ঠানের আছে নির্দিষ্ট 'ঋতু', ক্রমশঃ বৃহত্তর সত্য উপলব্ধির সুসম্বদ্ধ পর্যায়; সে বিধি, সে ঋতু যে জানে সে ঋত্বিক্। এ প্রণালি, এ কালচক্র অনুসরণ করতেই হবে।

আর ছয় হল নূতন সৃষ্টির প্রতীক, তাই রথের প্রত্যেক চাকার ছটা ক'রে আরা—সেই হল ষড় ঋতু। সৃষ্টির দুই ধারা, আরোহণ-অবরোহণ, দুই ধারায় মিলে পূর্ণাহ্ন বার—সম্বৎসর।

* প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হল, পরম পিতা তাঁর আত্মশক্তি থেকে নিঃসারিত করলেন বিশ্বজনীন প্রাণশক্তি ও জড় উপাদান, তা থেকেই সব জীব সৃষ্টি হল। সূর্যচন্দ্র হল তার বাহ্য দেশে পরিব্যাপ্তির কেন্দ্র ও প্রতীক। কালের আবর্তনে হয় তার পূর্ণ অভিব্যক্তি, ক্ষুদ্রতর কালচক্রে (মাসে) মনগ্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাবের পরিণতির সমবায়ে এবং আলো ও আঁধার, কর্ম ও বিরতি বা অর্জন ও আত্মীকরণের যুগল ভাবের মধ্য দিয়ে। সিদ্ধি হয় সংকল্প বা ব্রতের অনুরূপ—সকাম কর্মীদের হয় সংসার-চক্রে আবর্তন ও সত্যসন্ধানীদের হয় পরম গতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

১। তারপর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব প্রশ্ন করল,—"হে ভগবন্, সৃষ্ট জীবকে ধারণ করে ক'জন দেবতা। তাকে প্রকাশিতই বা করে কারা? তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"*

২। মহর্ষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন,—"এই দেবতা হল আকাশ, এবং বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এবং বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ। জীবকে প্রকাশিত ক'রে তারা আস্ফালন করে, 'আমরাই ভগবানের এই বীণার অবলম্বন, আমরাই তাকে ধারণ করে আছি।'

৩। "শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাদের বলল, 'মিথ্যা অহঙ্কার ক'রো না, আমিই নিজেকে পাঁচ ভাগে ভাগ ক'রে এই বীণাকে আশ্রয় দিয়ে ধারণ ক'রে আছি।' তারা বিশ্বাস করল না।

৪। "অভিমান ক'রে প্রাণ উঠে যেন দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। কিন্তু প্রাণ বেরিয়ে গেলে অপর সবকেও বেরিয়ে যেতে হয়, প্রাণ স্থগিত হলে অপর সবাই স্থগিত হয়। এ যেন সব নৌযাত্রি ও নৌযাত্রিদের রাজা; রাজা উড়লে আর সব নৌযাত্রিরাও ওড়ে, রাজা এসে চাকে বসলে আবার সব নৌযাত্রিরাও ফিরে আসে, তেমনি হল বাক্য-মন-চক্ষু-কর্ণের বেলায়।* তখন সন্তুষ্ট হয়ে তারা প্রাণের স্তুতি করল,—

৫। "'এই প্রাণই অগ্নি, এই সূর্যই উত্তাপ দেয়, এ-ই পর্জন্য ও ইন্দ্র, এ-ই বায়ু, এ-ই পৃথিবী, জড়ভূত এবং দেবতা, সাকার ও নিরাকার, এবং অমরত্ব।

৬। "'রথের চাকার নাভিতে যেমন সব আরা সংলগ্ন থাকে, তেমনি প্রাণেই সব স্থাপিত আছে—ঋক্-যজু-সাম মন্ত্র, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়ত্ব, সবই।‡

৭। "'পরম পিতারূপে তুমি গর্ভমধ্যে সঞ্চরণ কর, মাতাপিতার প্রতিরূপ সন্তান হয়ে তুমি জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ, প্রতিদেহে প্রাণবায়ু রূপে তুমি অবস্থান কর, তোমারই উদ্দেশে সব প্রাণী ভোগ্য আহরণ ক'রে তোমাকেই নিবেদন করে।

৮। "'দেবতাদের মধ্যে তুমি প্রচণ্ডতম শক্তিধর, পিতৃগণের উদ্দেশে তুমিই প্রথম তর্পণ, ঋষিদের সত্যধর্ম ও পুণ্যচরিত্র তুমিই, অঙ্গিরস ঋষিদের সন্তানদের মধ্যে তুমি অথর্বা।**

* দেবতা অর্থে সৃষ্টিতে সক্রিয় ভগবানের শক্তি। জ্ঞানের আলোকে ও কর্মের শক্তি দিয়ে তাঁরাই জীবের আত্ম-প্রকাশ সাধিত করেন।

* অনুরূপ আখ্যায়িকা বৃহদারণ্যকেও আছে।

‡ আধ্যাত্মিক রূপপরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় সব সত্য ও সাধনা, অন্তঃকরণের বহুতর বৃত্তি সব নির্ভর করে প্রাণের উপর।

** 'বহ্নি', তপোদেব অগ্নি, বল উৎসাহের প্রতীক, যা ভগবানের কাছে নিয়ে যায়; সে গুণ যার সব চেয়ে বেশী সেই 'বহ্নিতম'।

৯। "'হে প্রাণ তুমি ইন্দ্র, তেজে তুমি রুদ্র,* সবাইকে রক্ষা কর। আকাশে তুমি জ্যোতিষ্কের অধিপতি সূর্যরূপে চলাচল কর।

১০। "'হে প্রাণ, তুমি যখন বর্ষণ কর তখন সব প্রাণী অত্যন্ত আনন্দিত হয় কারণ তাতে কামনার অনুরূপ অন্ন জন্মায়ে।

১১। "'হে প্রাণ, তুমি অসংস্কৃত আবার তুমিই একমি নানক অগ্নি,—একমাত্র পবিত্রতা : তুমি বিশ্ব গ্রাস কর আমার সব অস্তিত্বের তুমি অধিপতি। তোমাকে আমরা আহার্য প্রদান করি, কারণ, হে মাতরিশ্বা,+ তুমি আমাদের পিতা।

১২। "'তোমার যে তনু বাকো, কর্ণে, চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আছে, যা মনে পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তাকে অনুকূল কর। উৎক্রান্ত হয়ো না।

১৩। "'এই সব বিশ্ব, এবং স্বর্গে যা প্রতিষ্ঠিত আছে সে সবই প্রাণের বশীভূত : মা যেমন সন্তানদের রক্ষা ও পালন করে, তেমনি তুমি আমাদের রক্ষা কর, আমাদের শ্রী ও প্রজ্ঞা বিধান কর।' "‡

তৃতীয় প্রশ্ন

১। তারপর কোসলদেশীয় আশ্বলের পুত্র তাঁকে প্রশ্ন করল,—"এই প্রাণ জন্মে কোথা থেকে? এই দেহেই বা আসে কি করে? নিজেকে বহু ভাগে বিভক্ত ক'রেই বা কিরূপে দেহে অবস্থান করে? কি অবলম্বন ক'রে উৎক্রান্ত হয়? বাহ্যব্যাপার পরিচালনা করে কিরূপে, অন্তঃকরণের ব্যাপারই বা কি ক'রে ধারণ করে?"

পিতৃপুরুষেরা যে সিদ্ধি অর্জন করেছেন তা স্মরণ ক'রে তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হল 'স্বধা'।

অঙ্গিরস ঋষিরা অগ্নির সন্তান, তাঁরা পরম সত্য আবিষ্কার করেছেন, 'কবিক্রতু' তাঁরা এবং অথর্বা আভ্যন্তরীণ যজ্ঞের দ্বারা সে সত্য উপলব্ধির পথ দেখিয়েছেন। (On the Veda, পৃ: ২৭৬ দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ সবিস্তারে আঙ্গিরস ঋষিদের কাজ বিচার করেছেন।)

* প্রচণ্ড ও করুণাময় রুদ্রদেব, প্রাণকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয় তার উপরে তিনি অধ্যক্ষতা করেন। (On the Veda, পৃ: ৪৩৮)।

+ 'মাতরিশ্বা', মায়ের কোল জুড়ে যে আছে, সে হল জড়ে ব্যাপ্ত হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে প্রাণশক্তির যে দিব্যতত্ত্ব। (দ্রঃ ঈশ, ৪ টীকা)

‡ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হল ব্যষ্টি প্রাণ বিশ্ব প্রাণেরই অভিব্যক্তি, ভাগবত শক্তি। জীবের সব ইন্দ্রিয়বৃত্তি, জ্ঞান ও কর্মের শক্তি সেই জোগায়, প্রগতির পথে সেই জীবকে নিয়ে যায়।

২। ঋষি তাকে বললেন, "বহু দুরূহ প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু তুমি অতি পবিত্রাত্মা,* অতএব তোমাকে সব বলছি।

৩। "আত্মা থেকেই এই প্রাণ জন্মে, এই পুরুষের যেমন ছায়া, তেমনি এই আত্মাতেই এই প্রাণ ব্যাপ্ত আছে এবং মনের ক্রিয়ার দ্বারা তা এই দেহে প্রবেশ করে।†

৪। "সম্রাট যেমন তাঁর কর্মচারিদের আদেশ দেন, 'এই এই গ্রাম তুমি শাসন কর', তেমনি মুখ্যপ্রাণও অন্যান্য সব প্রাণবায়ুকে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারে নিযুক্ত করে।

৫। "অপান বা নিম্নগামী বায়ু স্থাপিত হয় পায়ু ও উপস্থে; মুখ্য প্রাণ-বায়ু স্বয়ং অবস্থিত চক্ষু-কর্ণ-মুখ-নাসিকাতে; সমান-বায়ু অবস্থান করে মধ্যদেশে। এই সমানই পক্ক অন্নের আহুতির সমত্ব বিধান করে, আর তা থেকে জন্মে এই সপ্ত শিখা।‡

৬। "আত্মার অধিষ্ঠান হৃদয়ে। এখানে একশত নাড়ী আছে, তার প্রত্যেকটীর আবার একশ ক'রে শাখা, বাহাত্তর হাজার করে প্রতিশাখা; সে সবে ব্যান বিচরণ করে।

৭। "এতগুলির মধ্যে একটি আছে উর্ধ্বমুখী; সেপথে যায় উদান বায়ু, উৎক্রান্ত হয়ে নিয়ে যায় জীবকে পুণ্যফলে পুণ্য লোকে, পাপের ফলে পাপলোকে আর মিশ্রিত পাপপুণ্যের ফলে আবার মনুষ্যলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

৮। "সূর্যই বাহ্যবিশ্বের মুখ্যপ্রাণ, সূর্যোদয়ে চাক্ষুষ প্রাণ তৃপ্ত হয়। পৃথিবীর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে-ই মানবের অপান বায়ুকে আকর্ষণ করে। মধ্যদেশে যে আকাশ অবস্থিত সে-ই সমান। বায়ুই ব্যান।

---

* বা ব্রাহ্মণোচিত গুণে অতিশয় অলঙ্কৃত।

† অন্যান্য উপনিষদেও (যথা মুণ্ডক ২।১।৩) বলা হয়েছে যে আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মে। ছায়া যেমন কায়ার নিত্যসঙ্গী, প্রাণও তেমনি আত্মাতে শক্তিরূপে নিত্য অবস্থিত। 'ছায়া' শব্দ থেকে প্রাণের বিধ্যাত্ম অনুমান করা চলে না। প্রাণের স্বরূপ ও মনের ও জড়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ শ্রীঅরবিন্দ বিচার করেছেন দিব্যজীবন প্রথম খণ্ড ১৯শ অধ্যায়ে। তার শেষ দিকে বলছেন, "প্রাণ চিৎসত্তারই তেজোময় বিচ্ছুরণ।...জড় আর মনের যোগাযোগে প্রাণই বজায় রাখে দুয়ের সেতু হয়ে। সে যোগাযোগের সাধন হল প্রাণ, জীবদেহে নাড়ীতন্ত্রে চলিত প্রাণের অবিরাম বিদ্যুন্ময় প্রবাহ, যা রূপের শক্তিকে বোধে রূপান্তরিত ক'রে যেমন ঘটায় মনের বিপরিণাম, তেমনি মনের শক্তিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত ক'রে ঘটায় জড়ের বিকার।...কিন্তু নাড়ীর সার্থকতা শুধু পশুর দেহে প্রাণের রূপ। এই প্রাণই অখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আছে সকল রূপে, সর্বত্র সে এক চিৎশক্তিরই লীলা।"

(দিব্যজীবন, অনির্বাণের অনুবাদ, পৃ ২১৮-১৯)

‡ সপ্ত ইন্দ্রিয়, দ্রষ্টব্য মুণ্ডক, ২।১।৮।

৯। "তেজ বা আলোক যা মূলশক্তির প্রথম প্রকাশ সেই হল উদান। সুতরাং মানুষের তেজ ক্ষীণ হলে তার ইন্দ্রিয় সব মনে প্রবেশ করে এবং সেসব নিয়ে সে পরমদেবের জন্য প্রয়াণ করে।

১০। "কোন লোকের যা চিত্তবৃত্তি, মনের যা ভাব তা নিয়ে মৃত্যুকালে সে প্রাণের শরণ নেয় আর প্রাণ (বিশ্বের উদান বায়ু) তেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, জীবের আত্মাকে সঙ্গে ক'রে সংকল্পের অনুরূপ লোকে নিয়ে যায়।

১১। "যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রাণকে এভাবে জানে তার সন্তানহানি হয় না, সে অমর হয়। প্রয়াণ, এই শ্লোক—

১২। "'প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, অবস্থান, পঞ্চ প্রদেশের অধিকার এবং অধ্যাত্ম-সত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ যে জানে সে অমরত্ব উপভোগ করে।'"*

চতুর্থ প্রশ্ন

১। তারপর সূর্যবংশীয় গার্গ্য তাঁকে প্রশ্ন করল,—"হে ভগবন্, এই সত্তাতে নিদ্রা যায় কি কি? তাতে জাগ্রতই বা থাকে কি কি? স্বপ্ন দেখেই বা কোন্ দেব? এই সুখই বা হয় কার? কার মধ্যেই বা এসব একীভূত হয়ে বিলীন হয়?"

২। মহর্ষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন,—"অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের সব রশ্মি নিবৃত্ত হয়ে যেমন সে তেজোমণ্ডলে মিশে যায় আবার সূর্যোদয়ে সে সব উৎসারিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি মানুষের সবটাই পরমদেব মনেঃ একীভূত হয়ে যায়। সেই জন্যই তখন সে মানুষ আর কিছু শোনে না বা দেখে না, আঘ্রাণ বা স্বাদ নেয় না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, কিছু নেয় না বা দেয় না, যাতায়াত করে না, সুখ বোধ করে না। তখন বলা হয়, 'সে নিদ্রিত'।

---

* এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হল, প্রাণ আত্মার শক্তি; দেহে আসে মনের প্রভাবে, দেহ মনের সংযোগের সে সেতু; পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে মানুষের সব বৃত্তি পরিচালিত করে, তাকে পরলোকে নিয়ে যায়। বাহ্য জগতে বিরাট প্রাণ কাজ করে বাষ্টি দেহের অনুরূপ পঞ্চ প্রাণের আকারে। মৃত্যুর সময় সূক্ষ্মদেহাশ্রিত জীবকে সে সংকল্পানুরূপ লোকে নিয়ে যায়।

ঃ ব্যষ্টিজীবে অভিব্যক্ত তত্ত্বের মধ্যে মনই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাকে পরমদেব বলা হল।

৩। "এই নির্দিষ্ট পুরীতে সজাগ প্রহরী থাকে প্রাণরূপ অগ্নি সব। পশ্চিমদিকের গার্হপত্য অগ্নির অনুরূপ হল অপান, নিম্নগামী বায়ু ; সর্বব্যাপী ব্যান যেন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নাসিক আহুতি যাতে দেওয়া হয় সেই দক্ষিণাগ্নি ; প্রাণই যেন আহবনীয় অগ্নি,—গার্হপত্য অগ্নি থেকে সমিধ্ নিয়ে যেমন দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোমের অগ্নি, আহবনীয়, জ্বালান হয় তেমনি নিদ্রার অবস্থায় অপান বায়ু থেকে প্রাণের পুষ্টি হয়।

৪। "নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হল প্রাণবায়ুতে প্রদত্ত দুই আহুতি, পুরোহিতের মত তার মধ্যে সমতা বিধান করে সমান। মন যজমান আর যজ্ঞের ফল উদান, দিনে দিনে ক্রমশ: যজমান মনকে সে পবন ব্রহ্মের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।*

৫। "এখানে, এই দেবতা মনই স্বপ্নে নিজের মহিমা কল্পনায় অনুভব করে। যা যা দেখেছে সেই সবই যেন সে আবার দেখে, যা যা শুনেছে সেই সবই আবার শোনে, নানা দেশে নানা দিকে চিন্তা-জ্ঞান-বোধ যা এসেছে সেসব আবার নূতন করে অনুভব করে ; আবার, দেখা বা না দেখা, শোনা বা না শোনা, জানা বা না জানা, যা আছে যা নাই মন সে সবই দেখে, কারণ মনই বিশ্ব।

৬। "আলোকের দ্বারা যখন সে অভিভূত হয় তখন সে দেবতা, মন, আর স্বপ্ন দেখে না তখন সে এই দেহেই পরম সুখ পায়।

৭। "হে সৌম্য, যে গাছে পাখীরা বাসা বাঁধে সেই গাছেই যেমন দিনান্তে পাখা মেলে সব ফিরে আসে, তেমনি, সবই পরমাত্মার অভ্যন্তরে বিলীন হয়।

৮। "পৃথিবী ও তার অন্তরের বস্তু, জল-আলোক-বায়ু-আকাশ এবং সে সবের প্রত্যেকের অন্তরের বস্তু, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সে সবের প্রত্যেকের বৃত্তি ও বিষয়বোধ, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত-পদ-উপস্থ-পায়ু এই সব কর্মেন্দ্রিয় এবং তার প্রত্যেকের ক্রিয়া ও বিষয়, মন ও মনন, বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য, অহংভাব ও যাকে অহং বলা হয়, চিত্ত ও তার সংস্কার বা চেতনার বিষয়, আলোক ও যা আলোকিত হয়, প্রাণ এবং প্রাণ যে বিগ্রহকে ধারণ করে, সে সবই পরমাত্মাতে প্রবেশ করে।

---

* সে কালে গৃহস্থকে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত সেই ছিল 'গার্হপত্য' অগ্নি। তা থেকেই দেবতা ও পিতৃদের উদ্দেশ্যে হোমের আগুন জ্বালান হত। সবদিকে সমস্ত বজায় রেখে অগ্নিতে আহুতি দিত পুরোহিত এবং যজ্ঞফল ভোগ করত যজমান। সেই রূপক দিয়ে সদা জাগ্রত প্রাণশক্তির ব্যাখ্যা করা হল। বাইরের আগুন জ্বালিয়ে রাখবার প্রয়োজন এখন আর নাই, কিন্তু অন্তরের অভীপ্সার আগুনের বিষয়ে একথা এখনও সমান প্রযোজ্য।

৯। "কারণ আমাদের মধ্যে যে সত্তা দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ নেয়, অনুভব করে, বোঝে বা কাজ করে সে হল আমাদের বিজ্ঞানময় আত্মপুরুষ। সেও অবিনাশী পরম আত্মায় গিয়ে তবে বিলীন হয়।*

১০। "হে সৌম্য, এই ছায়াহীন, বর্ণহীন, অশরীরী, জ্যোতির্ময় ও অবিনাশী আত্মাকে যে জানে সে সর্বজ্ঞ হয়, সর্বময় হয়।† প্রমাণ এই শ্লোক :

১১। "ইন্দ্রিয়াদি সব দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞানময় আত্মা এবং প্রাণ ও পঞ্চভূত যাতে প্রবেশ করে সে অক্ষরকে যে জানে, সে সর্বজ্ঞ হয়, সর্বময়ের মধ্যে প্রবেশ করে।"‡

পঞ্চম প্রশ্ন

১। তারপর সৈব্য সত্যকাম প্রশ্ন করল, "হে ভগবান, মানুষের মধ্যে যে আমরণ ওঙ্কার মন্ত্র ধ্যান করে, সে কোন্ লোক জয় করে?"§

২। মহর্ষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন,—"বৎস সত্যকাম, এই অক্ষর মন্ত্র ওঙ্কার হল পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং যে বিদ্বান এই মন্ত্র নিয়েই থাকে, তার মধ্যেই বাস করে, সে এ দুয়ের একটিকে পায়।

৩। "একটিমাত্র মাত্রা বা অক্ষরের ধ্যান যে করে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সে সত্বর ইহ-জগতে সিদ্ধিলাভ করে; ঋক্‌মন্ত্র সব তাকে মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়; সেখানে সাধনা পবিত্রতা ও বিশ্বাস সম্পন্ন হয়ে সে গৌরবান্বিত হয়।

---

* বৃহদারণ্যক, ২।১।১৬-১৯-এও একথা বলা হয়েছে।

† অন্যত্রও, (যথা, মুণ্ডক ১।১।৩ এবং ছান্দোগ্য ৬।১) আছে যে অক্ষরকে জানে সে সর্বজ্ঞ হয়। একথার উদ্দেশ্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন (On Yoga, পৃ ৪২৭) যে, জ্ঞান-যোগের পথে আত্মার প্রথম উপলব্ধি হয় মনোময় সত্তার পশ্চাতে অবস্থিত, তার সব ভাব ও বৃত্তির আশ্রয় একমাত্র সত্বস্ত বলে; তারপর তার উপলব্ধি হয় বিশ্বের সব গতিবৃত্তির মধ্য দিয়ে যাঁর অভিব্যক্তি হচ্ছে সেই বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত অস্তিত্বরূপে। সুতরাং পরম সত্তার সব তত্ত্বের জ্ঞান, তাঁর আত্মপ্রকাশের সব মৌলিক ধারার বা বিভাবের জ্ঞান এবং প্রাতিভাসিক বিশ্বের সব তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের জ্ঞান, এ সবই আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

পরম সত্যের সন্ধানীদের পক্ষে এই হ'ল প্রথম তিন প্রশ্নের উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা।

‡ এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হল যে, নিদ্রিত অবস্থাতে জাগে প্রাণ, স্বপ্ন নিদ্রা ও দুঃখ হয় মনের, তার আশ্রয় হল আত্মা, তাকে জানতে হবে।

§ ওঙ্কার উপাসনার কথা কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ইত্যাদি অন্যান্য উপনিষদেও বলা হয়েছে।

৪। "দুই মাত্রা বা অক্ষরের দ্বারা মনে যে সিদ্ধিলাভ করে সে অন্তরিক্ষে উন্নীত হয়, যজুর্মন্ত্র সব তাকে চন্দ্রলোকে নিয়ে যায়, সেখানে বিভূতি সব আস্বাদন ক'রে আবার এই সংসার চক্রে সে ফিরে আসে।

৫। "কিন্তু যে এই অক্ষর মন্ত্র ওঙ্কারের তিন মাত্রাই অবলম্বন ক'রে পরম পুরুষের ধ্যান করে, সে তেজোময় সূর্যলোকে তার সংসিদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাপ যেমন জীর্ণত্বক ত্যাগ করে, তেমনি সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সামমন্ত্র সব নিয়ে যায় তাকে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে; এই জীবনঘন লোক থেকে সে পরাৎপর সর্বাত্মর্যামী পরমপুরুষকে দর্শন করে।*
এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে.—

৬। "'ত্রিমাত্রাত্মকরূপে তিনটিকে পৃথকভাবে ব্যবহার করলে তারা হয় মৃত্যুদুষ্ট, কারণ তারা অবিভাজ্য, অন্যোন্যাসক্ত। কিন্তু বিদ্বান তাতে বিচলিত হন না; কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রিত যে তিন রকম ক্রিয়া আছে,† সেসবই তিনি যথাযথভাবে নির্ভয়ে সম্পাদন করেন'।

৭। 'ঋক্‌মন্ত্রে পাওয়া যায় ইহলোক, যজুর্মন্ত্রে অন্তরিক্ষ আর সামমন্ত্রে পাওয়া যায় সেই তৎস্বরূপকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যাকে জানেন।‡ ওঙ্কার অবলম্বন ক'রে বিদ্বান ব্যক্তি সেই পরমশান্তি লাভ করেন যেখানে জরা নাই মৃত্যু নাই ভয় নাই'।"**

---

* সূর্যলোক হল অতিমানস ঊর্ধ্বতর স্বর্গলোক। কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদেও তার উল্লেখ আছে। সব অস্তিত্বের সারাৎসার মূল সত্য সেখানে অভিব্যক্ত, আদর্শ সৃষ্টি সেখানে বিদ্যমান, তাই তাকে জীবনঘন বলা হল, সর্বভূতের যোনি, বলা হয়েছে মাণ্ডুক্যে।

† জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—বাহ্য চেতনা, মনশ্চেতনা ও অন্তরতম চেতনার ক্রিয়া। একত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত জীবের সব কর্মই হয় সুষ্ঠু ও ভাগবত ইচ্ছার প্রকাশ, কোন কর্মে আর বন্ধন বা খুনাদের ভয় থাকে না।

‡ পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-স্বর্গলোকের উপর যথাক্রমে ঋক্-যজুঃ-সামের প্রভাব ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকেও উক্ত হয়েছে; এই তিন লোকের দেবতা অগ্নি-বায়ু-সূর্যের সঙ্গে তিন বেদের সরূপতার কথাও তাতে আছে। ঋগ্বেদে সংকলিত হয়েছে ঋষিদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা, পরমতত্ত্বের বর্ণনা; যজুর্বেদে আছে কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিবিধান; সামবেদে দেবতাদের মহিমাকীর্তন, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। সুতরাং এখানে বলা হল যে, পরমতত্ত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানে হয় ইহলোকে প্রতিষ্ঠা ও ঊর্ধ্বগামী অগ্নির উদ্দীপন, যজুর্বেদের কান্যকর্মে হয় পুণ্যফল ভোগের পর সংসারে পুনরাবৃত্তি, আর সামগানে অন্তরশুদ্ধির প্রভাবে হয় ঊর্ধ্বলোকে গতি।

** এ প্রশ্নের উত্তরে রূপক ভাষায় যা বলা হল তার তাৎপর্য বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ, **Foundations of Indian Culture** পৃ ৩১৩তে। তিন রকমের আন্তর

ষষ্ঠ প্রশ্ন

১। তার পর ভরদ্বাজগোত্রীয় সুকেশা প্রশ্ন করল,—"ভগবন, কোসল দেশের রাজপুত্র হিরণ্যনাভ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হে ভারদ্বাজ, তুমি কি অধ্যাত্ম পুরুষকে জান? জান তাঁর ষোড়শ কলা* কি কি?' সে রাজকুমারকে উত্তর দিলাম, 'না, আমি তা জানি না; জানলে আর কেন বলতাম না তোমায়। সমূলে শুকিয়ে মরে সে যে মিথ্যা কথা বলে; মিথ্যা তোমায় আমি বলতে পারি না।' আর কিছু না বলেই সে রথে চড়ে চলে গেল আমার কাছ থেকে। সেই পুরুষের বিষয় আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কোথায় বা কে সে পুরুষ?"

২। মহর্ষি পিপ্পলাদ বললেন তাকে,—"হে সৌম্য, সে পুরুষ এই এখানেই প্রত্যেক জীবের আভ্যন্তরীণ দেহেই আছেন; কারণ তাঁতেই ষোল কলা বা অঙ্গ উৎপন্ন হয়।

৩। "তিনি দেখতে চাইলেন, 'কি উৎক্রান্ত হলে আমাকেও দেহত্যাগ করতে হয়, কি স্থির হয়ে থাকলে আমিও সুস্থিত থাকি'।"

৪। "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করলেন, প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা বিশ্বাস, আকাশ-বায়ু-আলোক-জল-পৃথিবী এই পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় ও মন; তারপর, অন্ন ও অন্ন থেকে সৃষ্টি করলেন বীর্য, তপস্যা ও মন্ত্র এবং কর্ম ও তা থেকে উদ্ভূত সব লোক এবং প্রতি লোকে, সৃষ্টি করলেন নাম। এই ভাবে অধ্যাত্মপুরুষ থেকে সব জন্মাল।

৫। "সুতরাং যেমন সাগরগামী স্রোতস্বতী নদী সব স্বধাম সমুদ্রে পৌঁছে তাতে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তাদের পৃথক পৃথক নাম ও রূপ লুপ্ত হয়, সর্বসমষ্টিকে সমুদ্রই বলা হয়; তেমনি পরিদ্রষ্টা অধ্যাত্ম পুরুষের এই সব ষোল কলার গতি পুরুষের অভিমুখে, তাঁকে লাভ ক'রে তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে হারিয়ে ফেলে, পৃথক নামরূপ আর থাকে না, সব নিয়ে কেবলমাত্র পুরুষই বলা হয়; তখন সেই পুরুষ হয় নিষ্কল ও অমৃত। এ বিষয়ে প্রমাণ এই শ্লোক,—

অভিজ্ঞতা আছে, তার দ্বারা বাহ্য, মানস ও অতিমানস স্তরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। অতিমানস সিদ্ধি থেকেই পরিশেষে হয় অমর পরমাত্মার শান্ত নিত্যতার মধ্যে সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ ও সর্বতোমুখী স্ফুরণ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এই কথাই বুদ্ধিগ্রাহ্য তাত্ত্বিক ভাষায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

* মুণ্ডক ৩।২।৭ দ্রষ্টব্য। পুরুষের ষোল কলার কথা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে।

৬। "'যথের চাকার সব আরা যেমন নাভিতে সংলগ্ন থাকে, তেমনি এই সব কলা যাঁতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে, তিনিই সব জ্ঞানের দক্ষা পরম পুরুষ, তাঁকে জানো ; যাতে আর তোমাদের কাছে মৃত্যু ও তজ্জনিত শোক বেদনা না আসতে পারে'।"*

৭। তাদের তিনি বললেন, "পরম ব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি, এর পর আর কিছু নাই।"

৮। তারা তাঁকে অর্চনা ক'রে বলল, "আপনি আমাদের পিতা, অবিদ্যার ওপারে আমাদের উপনীত করেছেন। পরম ঋষিদের প্রণাম, প্রণাম।"✦

---

* বৃহক ১।২।৮ এবং এ উপনা আছে, অন্যান্য উপনিষদেও অনেক স্থানে আছে। তবে যাহাতে বেদবের উৎপত্তি হয়, ('প্রভবতি', দ্বিতীয় শ্লোক) সে সবকে অবিদ্যা আরোপিত বিশ্বা উপাধি বলা চলে না। সে-সব থেকে পৃথক ক'রে আত্মাকে সাক্ষী, নিয়ন্তা ও ঈশ্বর বলে জানতে হবে অবশ্য, কিন্তু এসবও পুরুষেরই আত্মশক্তির সত্তা বিগ্রহ। আর বাহ্য আত্মার মধ্যে তার সব ভাব ও বৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত হলে তার পরম সত্য স্বরূপ উপলব্ধি হয় ; সেই হল জ্ঞানযোগের শেষ কথা।

✦ অনুবাদ ও পাদটীকা—নলিনীকান্ত সেন।

দিব্য-জীবন

[অবতরণিকা]

অনির্বাণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩৫

অতিমানসের পানে (খ)

উত্তর-মানসের বৃত্তি ভাবনার চিদ্‌বৃত্তি, অথচ তাতে আছে প্রাকৃত বাস্তব-প্রত্যয়ের একান্ত স্পষ্টতা। মনের ঠিক উজানেই উত্তর-মানসের ভূমি বলে মনন তার সহজ ধর্ম। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ-মনন প্রাকৃত তর্ক-বুদ্ধির মনন নয়, যৌল-সত্যের অপরোক্ষদর্শন-জনিত দিব্য-মনন। দার্শনিকের অন্তর্মুখ চেতনার কখনও-কখনও এই মননের অনুরূপ একটা-কিছুর ঝলক দেখা দিতে পারে, কেননা প্রাকৃত-মননকে ভাবসাধনার তুরভূমিতে নিয়ে যাবার একান্ত প্রয়াস কেবল তাঁরই, তিনিই চান এক তত্ত্বের মাঝে বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটাতে। তবুও উত্তর-মানসের আলো সাক্ষাৎভাবে তাঁর মনেও পড়ে না, কেননা যে-তাদাত্ম্য-বোধ বিজ্ঞানবৃত্তির যৌলধর্ম, তা তাঁর মননে নাই। তিনি একের মাঝে বহুকে দেখতে চান, কিন্তু হয়ে দেখেন না। এই হওয়ার দিকে ঝোঁক রয়েছে অধ্যাত্মসাধকের—দার্শনিকের নাই, বৈজ্ঞানিকেরও নাই, যদিও প্রাকৃতজগতে ভাবসাধনার শ্রেষ্ঠ কারবারী তাঁরাই। অধ্যাত্মসাধক সত্যের মনন করেন সাযুজ্যলাভের জন্য। গোড়া থেকেই তাঁর সত্যের বোধে একটা প্রবণতা থাকে লোকোত্তরের দিকে, তাই তাঁর মনন হয় বিজ্ঞান-বাসিত। এইখানে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর তফাত। আধারের সবখানি দিয়ে একটা বৃহৎ বস্তুকে তিনি পেয়েই রয়েছেন এবং তারই আবেশে চলছে তাঁর মননের ক্রিয়া। সুতরাং সে-মননে প্রকাশ পাচ্ছে একটা অখণ্ড সত্যানুভূতিরই বিচিত্র সত্তা-বিভূতি। ন্যায়ের অবরোহ-প্রত্যয়ে (deduction) যেমন কোনও ভুল থাকতে পারে না, তেমনি তাঁর মননও কখনও অসত্য সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হতে পারে না, কেননা যে-ব্যাপ্তিবোধ (intuition of the universal) তাঁর অবরোহ-প্রত্যয়ের ভিত্তি, তা ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যয়ের সমাহার নয় কিন্তু বিশ্বের কোনও যৌল-সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন।

প্রাকৃত মননে কিন্তু এমনিতর নৈশ্চিত্যের আশ্বাস নাই। দার্শনিক বলেন, যে সামান্য-

জ্ঞানকে ভিত্তি করে আমাদের প্রাকৃত মনন চলে, তা একটা গড়পড়তা সিদ্ধান্ত মাত্র, সুতরাং তার আশ্রিত সিদ্ধান্তও যে ধ্রুবসত্য হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। ব্যাবহারিক জগতে এই গড়পড়তা সত্যকে নিয়েই কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে আমাদের কাজ চলছে। একটা ঘটনার পরিণাম কি দাঁড়াবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি মাত্র। কিন্তু ঠিক কি ঘটবে তা জোর করে বলতে পারি না। সমষ্টির বেলাতে যদিও-বা একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেল তো ব্যক্তির বেলায় দেখা গেল তার মাঝে একশ টা ব্যতিক্রম। প্রাকৃত ভূমিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন তাই নানা অনিশ্চয়তার একটা জগাখিচুড়ী। মন অনবরত ভেবে চলেছে, কিন্তু ভেবে কোনও কূল পাচ্ছে না। সংসারে তাই অসোয়াস্তিরও সীমা নাই।

অথচ প্রাকৃত মনও সত্য জানবার চেষ্টাই করছে। কিন্তু তার জানবার মুখ্যসাধন হল ইন্দ্রিয়, যার দৃষ্টি বস্তুর গভীরে পৌঁছতে পারে না, বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বাইরে থেকে বস্তুকে সে যতটুকু জানে তা সত্যের একটা ভগ্নাংশ বা বিকৃত রূপ মাত্র। এই ভাঙাচোরার বেসাতি নিয়েই বহির্মুখ মনের কারবার।

অন্তর্মুখ মনের ধারা স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়কে সেও ব্যবহার করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পিছনে-পিছনে সে ছোটে না। ইন্দ্রিয়ের আহরিত জ্ঞান তার মাঝে তখন-তখনই প্রবৃত্তির সংবেগ জাগায় না। বাইরে থেকে যা আসে তা প্রথম তার গভীরে তলিয়ে যায়। বিষয়কে এমনি করে গ্রাস করে অন্তরের গভীরে তলিয়ে দেবার সাধনাই হল উত্তর-মানসের ভূমিতে পৌঁছবার উপায়। বিষয়ের সংস্পর্শে সত্তার মর্মমূলে যে-সাড়া জাগে, তাতে বোধির আলো জ্বলে ওঠে এবং সেই আলোতে বিষয়ের সত্য রূপটি আত্মীয় হয়ে বিষয়ীর কাছে ধরা পড়ে। চলতি কথায় একেই বলে 'প্রাণ স্পর্শ করা।' সুতরাং এ-অভিজ্ঞতা প্রাকৃত ভূমিতেও বিরল নয়। কিন্তু সাধারণত এ-ব্যাপারেও আমরা বাইরের উপর নির্ভর করি বলে কদাচিৎ কোনও-কিছু আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। অন্তর্মুখ চিত্তের স্বচ্ছতায় ব্যাপারটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। প্রাণকে তখন আর জাগিয়ে দিতে হয় না, নিত্যজাগ্রত থেকে বাইরের যা-কিছু সবই সে গ্রাস করে নিজের আগুনে আগুন করে তোলে। সমস্ত জগৎটাই তখন প্রাণাগ্নির ইন্ধন। ইন্দ্রিয়-মনের বৃত্তি, সুখ-দুঃখের দোলা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংবেগ সব-কিছুরই তখন আবিষ্কৃত হয় একটা চিন্ময় তাৎপর্য। এমনি করে প্রাণের পুষ্টিতে যে-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় অন্তরে, উত্তর-মানসের বৃত্তি তার সহজ ধর্ম। আমার মাঝে আমাকে আমি নিশ্চিতরূপে পেয়েছি বলে তখন আমার জ্ঞানও হয় নৈশ্চিত্যের বাহন। আমার জানায় তখন আর সংশয়ের দ্বিধা বা অর্ধসত্যের ভেজাল থাকে না। সঙ্গে-সঙ্গে অজানার দিগন্তও প্রসারিত হতে থাকে। সে আর তখন আচ্ছন্ন মনের কাছে কল্পনার মুখোস পরে হাজির হয় না, স্বানুভবের বিভূতি-রূপে যোগীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তার নিরাবরণ রূপ।

উত্তর-মানসের এই হল জ্ঞানের দিক। কিন্তু এছাড়া তার একটা সঙ্কল্পের দিকও আছে। বস্তুত জ্ঞান ও সঙ্কল্প একই চিৎশক্তির দুটি সহচরিত (concomitant) বৃত্তি। ব্যাবহারিক জগতে এই সহচারের ভাবটি সবসময় স্পষ্ট নয়। বাইরের জগতে আমরা জানতে পারি অনেক-কিছু, কিন্তু আমাদের শক্তি কুণ্ঠিত বলে করবার তত-কিছু থাকে না। তাইতে জ্ঞানের অনেকখানি জমিই আপাতদৃষ্টিতে অনাবাদী পড়ে থাকে। কিন্তু অন্তরের গভীরে জানা যেখানে হওয়ার সঙ্গে এক হয়ে আছে, সেখানে জ্ঞানের সবটুকুই সক্রিয়। জ্ঞান সেখানে সৃষ্টিধর্মী, বীজরূপে অনুভূত সত্যকে বনস্পতিতে বিস্ফারিত করাই তার কাজ। আমি স্বরূপত আমাকে যা বলে জেনেছি, আমার আত্ম-প্রকৃতিতেও তাকে রূপায়িত করে তুলতে হবে, এই তখন আমার অনতিবর্তনীয় দায়। এইখানেই উত্তর-মানসের সঙ্কল্পশক্তি ভাবনার বীর্যকে আশ্রয় করে সাধকের জীবনে শুরু করে দেয় রূপান্তরের কাজ। ভাল হওয়া যে কি তা জানি এবং মনেও করছি ভাল হব, কিন্তু তবুও ভাল হতে পারছি না—প্রাকৃত মনের এই নির্বীর্যতা উত্তরমানসের ধর্ম নয়। সত্যের আদর্শকে সে তো বাইরে দেখে না, তাকে সে অনুভব করে আত্মসত্তার গভীরে। তাই তার প্রত্যেক জানাই এক ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে হওয়ায় রূপান্তরিত হয়। দেহ-প্রাণ-মন সব-কিছুর মাঝে সঞ্চারিত হয় এক দিব্যভাবনার মহাবীর্য, প্রত্যেকটি মনন হয় সৃষ্টির মন্ত্র এবং এক অবশ্য সঙ্কল্পের প্রবেগে আধারকে সবরকমে তা নতুন করে গড়ে তোলে।

জানার সঙ্গে হওয়ার সম্পর্কটি এইখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি যখন যা জানছি, তখনই তা হতে পারছি—এই হল উত্তর-মানসের সঙ্কল্পের সহজ ধর্ম। যা ভাবলাম, তা-ই হলাম—এমনটা প্রাকৃতজনের বেলাতেও ঘটে। কিন্তু তখন হওয়ার গতি থাকে নীচের দিকে। মন্দ ভেবে মন্দ হওয়াটা প্রাকৃত মানুষের পক্ষে খুব সহজ, কেননা তার অপরা-প্রকৃতির মাঝে গড়িয়ে চলার দিকে একটা প্রবণতা আছে, যাকে কোনও-কোনও ধর্মে মানুষের স্বভাবে নিহিত 'আদিম পাপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেহের অনেক ব্যাধির মূলে রয়েছে মনের মূঢ় ভাবনা, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই আবিষ্কারেও বলতে গেলে ঐ আদিম পাপপ্রবণতারই পরিচয়। ভাবই যে বস্তুতে রূপ নেয়, এই সত্যের এগুলো হল জলজ্যান্ত উদাহরণ। কিন্তু এ হল অপরা-প্রকৃতির খেলা। পরা-প্রকৃতিতেও এই সত্যই কাজ করছে, অর্থাৎ সেখানেও ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে ভাবই বস্তুতে রূপ নিচ্ছে এ-কথা স্বীকার করতে কোনও বাধা নাই। 'আমি ব্রহ্ম' বলতে-বলতে মানুষ ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনি আবার 'আমি পাপী' বলতে-বলতে পাপী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়, বরং অপরা-প্রকৃতির পিছটানে এইটাই আমাদের পক্ষে সহজ। কথায় বলে, 'যেমন ভাব, তেমন লাভ'। আমাকে আমার ভাবনা দিয়েই আমি প্রতিনিয়ত গড়ে তুলছি। প্রকৃতির এই সহজ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে অহরহ দিব্যভাবনার

আবেশ দিয়ে আত্মপ্রত্যয়কে চেতিয়ে রাখা, মননকে বলিষ্ঠ করা—এইগুলো হল উত্তর-মানসের সাধনাঙ্গ। সোজা কথায় তাকে বলতে পারি, বৃহতের ভাবনায় বৃহৎ হওয়া।

অনেকে মনে করবে, এ তো কেবল কল্পনা। কিন্তু আমাদের জীবনে কল্পনার প্রভাব কি কিছু কম? বস্তুর কল্পনা সবসময় সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমার ভাব বা কল্পনা যে সদা-সর্বদাই আমার চেতনায় বিকার ঘটাচ্ছে এ কি অস্বীকার করতে পারি? অতীত দুঃখের স্মৃতিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ছি, অনাগত দুঃখের ভাবনায় আঁৎকে উঠছি—এগুলো কি কল্পনার বাস্তব পরিণাম নয়? প্রশংসায় ফেঁপে উঠছি, আবার নিন্দায় চুপসে যাচ্ছি—যদিও বেশ জানি দু'টাই আমার সম্বন্ধে অপরের কল্পনা মাত্র। এমনি করে পরের কল্পনার প্রভাবকে জীবনে মেনে নিয়ে মিথ্যার বেসাতি করতে আমাদের বাধে না, অথচ আত্ম-স্বরূপের সত্য ভাবনাতেই যত দোষ?

সবর্ধ (effective) ভাবনার সাধনা শুরু করবে এই প্রাকৃত মনই। যদি তার মাঝে শ্রদ্ধা এবং সঙ্কল্পশক্তির জোর না থাকে, তাহলে প্রথম-প্রথম ভাবনার ফলে চেতনায় আশানুরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হবে না। এই সময়টায় নেতি-ভাবনায় সাধকের খুব উপকার হয়। নেতি-ভাবনার আরেক নাম প্রত্যাখ্যান (rejection)। দেহ-প্রাণ মনের প্রাকৃত বৃত্তিগুলি এসে সাধককে ছেঁকে ধরছে, আর সে সবলে তাদের প্রত্যাখ্যান করে বলছে, 'না, দেহ-প্রাণ-মনের এই অন্ধ বিকার আমি নই, আমি শিবস্বরূপ, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ'—এই হল নেতি-ভাবনার স্বরূপ। এর জন্য চাই অতন্দ্র আত্মসচেতনতা। আমার আত্মসচেতনতাকে অহরহ অনুভব করছি প্রসন্ন উদ্ভাসন উদার আকাশের মত, সর্বদা সতর্ক থেকে দেখছি তাতে যেন কোনও মেঘ না জমে। মেঘের ছায়া পড়তেই তাকে যেমন প্রত্যাখ্যান করছি, তেমনি তার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে তার পরে আমার প্রসন্ন মহিমার আলোও ঢালছি। সে-আলোর ধারাসারে হয় মেঘ গলে যাবে, নয়তো জ্যোতির্বাষ্পময় হয়ে ঝলতে থাকবে। বলা বাহুল্য, এ-আলো বৃহতের আলো, তাঁরই দীপ্তচেতনার স্পর্শে আমার আত্মদীপের সুখটির জ্বলে ওঠা। প্রত্যাখ্যানের বীর্যের সঙ্গে প্রসাদের ভাবনাকে এমনি করে যুক্ত করলে তার শক্তি হয় দুর্বার, কেননা উৎসের সঙ্গে যোগ থাকাতে তখন শক্তির যোগান অফুরন্ত হয়।

এমনি করে প্রবর্ত-সাধক যদি 'মননস্কঃ সদাশুচিঃ' হয়ে সাধনা করে চলে, তাহলে ক্রমে প্রাকৃত মনের নেতি-ভাবনা রূপান্তরিত হয় উত্তর-মানসের ইতি-ভাবনাতে। উপর হতে যে-আলো অনবরত আধারের উপর ঝরে পড়ছে, তার অনুভব তখন সহজ হয়। অবশ্য তাতেই সাধনার পথের সব বাধা যে কেটে যায় তা নয়। প্রাকৃত-মনের ক্রিয়া তখন হয়তো ছন্দোময় হয়, একটা ঊর্ধ্বশক্তির অনুকূল সাধনরূপে সে হয়তো কাজ করে যায়, কিন্তু অবচেতনা বা অচেতনার গভীর হতে নানা অতর্কিত উৎপাত এসে তখনও তার চলনে ছন্দো-

ভঙ্গ ঘটাতে পারে। প্রাচীন যোগশাস্ত্রে এগুলোকে বলা হত 'আশয়'। আশয়ের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে না। আশয়ের মূল রয়েছে চেতনার গভীরে, সুতরাং তাদের উৎখাত করতে হলে সাধককেও সেই গভীরে ডুবতে হবে। এই গভীরে ডোবার সাধনা হল প্রশমের (quiescence) সাধনা—ইচ্ছামাত্র দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়কে অনুদ্বিগ্ন প্রশান্ত এবং নিষ্ক্রিয় করবার সাধনা। অবশ্য প্রশমের সাধনাকেও পূর্ণযোগের সমগ্র সাধনার অনুকূল করে নিতে হবে, তাকে একান্ত করে তুললে চলবে না, কেননা তাতে প্রকৃতির ক্রিয়া নিরুদ্ধ হলেও তার রূপান্তর নাও ঘটতে পারে।

প্রশমের সাধনা সহজ হতে পারে শূন্য-ভাবনার দ্বারা। এই শূন্য কিন্তু কোনও নেতিবাচক প্রত্যয় নয়, এ হল নির্বর্ণ নিষ্পন্দ বিরাট্ আকাশের মত এক সর্বাবগাহী অথচ সর্বাতিগামী অস্তিত্বের নিখর বোধ। অননিতেও আমাদের মন কখনও-কখনও ফাঁকা হয়ে যায়। ঐ ফাঁকাকে যদি বোধির আলোকে প্রদীপ্ত এবং প্রসারিত করতে পারি, তাহলে সহজেই এই গভীর শূন্যতার বোধ আমাদের মাঝে আসতে পারে, এমন-কি তাকে আমাদের নিত্য-সহচর করে রাখাও অসম্ভব হয় না। চিত্তে তার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায় এক প্রসন্ন উদার নিরাসক্তিতে। চিত্তগত এই শূন্যতার বোধকে অভ্যাসের দ্বারা দেহগত করতে হবে এবং ক্রমে তাকে তলিয়ে দিতে হবে নেরুতস্তর গভীরে। শূন্যতার বোধ ঐখানে জাগালে তবে তা আমাদের আশয়ের মর্মে আঘাত করে তাদের গ্রন্থিগুলিকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে। আশয়ের মূল রয়েছে জড়প্রকৃতির আড়ষ্টতায়; তাই শূন্য-ভাবনাকে দেহগত না করা পর্যন্ত তার ঘোর কাটিয়ে ওঠা যায় না।

এগুলি হল ব্যষ্টি আধারের বাধা। কিন্তু তার বাইরে থেকেও বাধা আসতে পারে। ব্যষ্টি-প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বিশ্বের ভাল-মন্দ সব-কিছুর প্রভাব আমার উপরেও পড়ে। নিজেকে রক্ষাকবচে ঘিরে বিশ্বের অভিঘাত হতে বাঁচাতে গিয়েও সবসময় তা পারি না। তাই বৈকল্যের হেতু আমার মাঝে না থাকলেও তার ঝাপটা কখনও বাইরে থেকে আমার মাঝে ঢুকে পড়তে পারে। এগুলোর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে গভীরতা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা তিন দিক দিয়েই চেতনার আরও প্রসার ঘটাতে হয়। বস্তুত এই প্রসারের কোনও সীমা আঁকা চলে না। অবিদ্যার যে-শক্তি জড়ের মর্মমূলে, তার সঙ্গে মোকাবিলা না করতে পারলে রূপান্তর সম্যক্‌ভাবে সিদ্ধ হতে পারে না। মূলাবিদ্যাকে (radical ignorance) অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে,—বিদেহমুক্তির সাধক তা-ই করেন। তিনি বলেন, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার হাত হতে আমাদের নিস্তার নাই। সুতরাং জীবন্মুক্তি সত্যকার মুক্তি হতে পারে না। জীবন অবিদ্যাগ্রস্ত, সত্য মুক্তি তাকে পেরিয়ে গিয়ে। পূর্ণযোগী অবশ্য এ-মত স্বীকার করেন না। তাঁর মুক্তি এইখানে, জীবনের

এপারে। আবার এই জীবন্মুক্তিও তিনি চান একার জন্য নয়—সবার জন্য। তাই তাঁর সিদ্ধির আদর্শ শুধু তুলাবিদ্যার (individual ignorance) নিরসন নয়, মূলাবিদ্যার সর্ববিদ্যায় রূপান্তর। এইজন্যই উত্তরমানসের বীর্যকে সিদ্ধির পক্ষে তিনি পর্যাপ্ত বলে করতে পারেন না।

উত্তর-মানস অতিমানসের পথে চেতনার প্রাথমিক ভূমি মাত্র। চেতনাকে তা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা হতে মুক্ত করে, বস্তুর দিক হতে মনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সে করে ভাবনির্ভর। তার কাছে ভাবই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, বস্তু তার বিভূতি মাত্র। সুতরাং তার মননের ধারা হয় অবরোহী, নিত্যসিদ্ধ ভাবকে আশ্রয় করে সে বস্তুর বিচার করে। এখনি-কল্পে ভাবমুখে থাকা সিদ্ধ-চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু চেতনায় ভাবনুখীনতার প্রতিষ্ঠা শুধু উত্তর-মানসের পৌঁছতে হয় না, সাধককে তার জন্য যেতে হয় আরও উজানে। সাধনার সর্বত্রই এই রীতি। উত্তরশক্তির আবেশেই অবরশক্তির ক্রিয়া সুষম এবং সুপ্রতিষ্ঠ হয়। যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তির সৌষম্য ঘটায় মন, মনোবৃত্তির সৌষম্য ঘটায় বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তির সৌষম্য ঘটায় বোধি। উত্তর-মানস হতেই শুরু হল বোধির ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বস্তুর বন্ধন হতে মুক্ত হল, হল ভাবের বাহন। কিন্তু এই ভাব-সিদ্ধি উত্তর-মানসের স্বাভাবিক ধর্ম হলেও ভাব-শক্তির যোগান আসছে আরও উজানে প্রভাস-মানস থেকে। অতিমানসের পথে এই হল অদ্বৈত-চেতনার দ্বিতীয় ভূমি। এখন তারই কথা বলব।

প্রভাস-মানসের স্বরূপ বুঝতে পারব প্রাকৃত-মানসের সঙ্গে বিপরীতক্রমে তার তুলনা করে। প্রাকৃত মন যখন অন্তর্মুখ হয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হতে মানস-প্রত্যক্ষের দিকে যখন তার মোড় ফেরে, তখন আমরা তার উৎকর্ষের পরিচয় পাই। বস্তু হতে ভাব বড়, এই স্বীকৃতির 'পরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের প্রগতির বনিয়াদ। কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের যে-ঘনত্ব আছে, মানস-প্রত্যক্ষের তা নাই, এইখানে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জিত। তাই মানস-প্রত্যক্ষকেও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মতই চিদ্‌ঘন করে তুলতে হবে, এই হল সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার আসল কথা। তার এ-দাবি মেটানো যে অসম্ভব নয়, তার নিশানা আমরা পাই প্রাকৃত অনুভবের মাঝেই। ভাব প্রবল হয়ে চেতনার যে-আলোড়ন তোলে, নিছক বস্তুসত্তার চাইতে আমাদের কাছে তারই দাম বেশী। বস্তু তখন ভাবকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্য না থাকলে ক্ষীণবীর্য চেতনায় ভাবের সাড়া মিইয়ে যায়, তাই আমরা বস্তুকে আঁকড়ে থাকি। একবারের দেখা যদি অন্তরে চিরন্তন হয় (যেমন গভীর ভালবাসার হতে পারে), তাহলে উপলক্ষ্যকে আঁকড়ে থাকবার আর তত প্রয়োজন হয় না। তখন বস্তুনিরপেক্ষ চেতনার একটা নতুন পরিণাম (development) শুরু হয় : ভাব গাঢ়

হয়ে অন্তরেই বস্তুর চিন্ময় রূপ গড়ে তুলতে থাকে। পরিণামের এই ক্রিয়া প্রাকৃত স্বপ্নচেতনার মূলেও কাজ করছে। ধ্যানচিত্তে ইষ্টের সঙ্গে সম্প্রয়োগও (communion) ঘটে এই রীতিতেই।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মনকে যখন উজানধারায় বইয়ে দিই, তখন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েও ভাবের গাঢ়তায় আমরা অনন্তিত্বের একটা বাস্তব প্রত্যক্ষে আবার ফিরে আসতে পারি। অবশ্য এটা নির্ভর করে সাধকের রুচি এবং সংস্কারের 'পরে। তিনি যদি নির্বি-শেষের সাধক হন, তাহলে ফিকে ভাবকে শূন্যে মিলিয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য হবে, তাকে জমাট বাঁধতে তিনি দেবেন না ইচ্ছা করেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মেই ভাব জমাট বাঁধে। পুঁথির পাতায় তার বিবরণ না থাকলেও মরমীয়ার অন্তর তার উল্লাসকে অত্যন্ত সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

ভাব ঘনীভূত হয়ে যদি চিন্ময়-প্রত্যক্ষের সাধন (means) হয়, তাহলে আর মনের ক্রিয়া থাকে না, কিংবা থাকলেও তা ভাববাসিত হয়েই দেখা দেয়। সব অনুভবেরই পর্য-বসান ঘটে প্রত্যক্ষে। প্রত্যক্ষের পথে বাধা থাকলেই মন ভাবনায় মুখর হয়ে ওঠে। অন্যথা মনের এই মুখরতারও একটা সার্থকতা আছে: এমনিকরেই সে প্রত্যক্ষের নতুন প্রকার বা নতুন ভূমির সন্ধান পায়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করে যে-ভাব জাগে, তা বস্তুর মাঝে একটা নতুন অর্থের আবিষ্কার করে। মন, আবার সে-অর্থকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে। এমনিকরে ইন্দ্রিয়-মনের পারস্পরিক ক্রিয়ার আনাগোনায় অনুভবের প্রসার ঘটে।

এই যদি চেতনার পরিণামের সাধারণ রীতি হয়, তাহলে প্রাকৃত-মানস, উত্তর-মানস আর প্রভাস-মানসের কি সম্পর্ক, তা বুঝতে কষ্ট হবে না। প্রাকৃত-মানস ইন্দ্রিয়নির্ভর আর উত্তর-মানস ভাবনির্ভর একথা আমরা আগেই বলেছি। প্রাকৃত-মানস থেকে উত্তর-মানসে যেতে হলে আমরা ইন্দ্রিয় হতে ভাবে, বিশেষদর্শন হতে সামান্যভাবনার দিকে উজিয়ে যাই। এই সামান্যভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবকে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষে ঘনীভূত করতে পারি, তাহলেই পাই প্রভাস-মানসের ভূমি।

উত্তর-মানসের পরিপাকে প্রভাস-মানস স্বভাবের নিয়মেই জাগে। সুতরাং চিন্ময়-প্রত্যক্ষ সামান্যভাবনারই স্বাভাবিক পরিণাম, ঠিক যেমন প্রাকৃত-ভূমিতেও ভাব গাঢ় হয়ে ভাবময়-প্রত্যক্ষের একটা আভাস দেখা দিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃত ভাবময়-প্রত্যক্ষ হল অবিদ্যার বৃত্তি, সুতরাং তার বাস্তবতার ভিত্তি দুর্বল—যেমন স্বপ্নে, কল্পনায়, বিভ্রমে (illusion) বা কুহকে (hallucination)। আর প্রভাস-মানসের চিন্ময়-প্রত্যক্ষ হল বিদ্যার বৃত্তি। তার ফলে বস্তুর স্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে। গভীর ভালবাসায় এই স্বরূপানুভবের একটা আভাস ফোটে। আমার যে মনের মানুষ, সে

চিন্ময়। আমি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে তাকে রচনা করেছি তা নয়, আবার প্রাতিভ-সংবিৎ দিয়ে তাকে আমি আবিষ্কার করেছি। সে আরোপ-মানুষ নয়, স্বরূপ-মানুষ। তার স্বরূপ আর সত্যের স্বরূপ একাকার। সে-সত্য যেমন তাতে আছে, তেমনি আমাতেও আছে। সুতরাং তাকে জানার অর্থ আমাকেই জানা, দুয়ে মিলে সেই এককেই জানা—'অনাদিকালের উৎস হতে' প্রবাহিত একটি যুগল স্রোতকে জানা।

অবশ্য এও প্রভাস-মানসের বৃত্তির একটা উদাহরণ মাত্র। স্বরূপত প্রভাস-মানস এক বিশাল অদ্বৈত-চেতনার ভূমি। তার মাঝে আছে নির্বেদ আকাশের আলোঝলমল এক অসীম বৈপুল্য। হৃদয়ের প্রদ্যোত সেখানে কূল ছাপিয়ে গেছে, বিশ্বের সব-কিছুকে জড়িয়ে ধরছে এক জ্যোতিরুচ্ছল আলিঙ্গনে। আবার এ-ভূমি অবাঙমনসগোচর এই অর্থে যে চিন্ময় সংবেদনের জন্য সেখানে মন বা ভাষার কোনও প্রয়োজন হয় না ; অথচ দিব্যমনন ও বাণীর সে প্রবর্তক হতে পারে। যে-অপরোক্ষদৃষ্টি দিয়ে অখণ্ড স্বরূপসত্যকে প্রত্যক্ষ করছি, তারই সংবেগ স্ফুরিত হচ্ছে চিন্ময় মননে, চিন্ময় বাণীতে। অর্থাৎ এখানেও এক উর্ধ্বভূমির প্রতিষ্ঠা হতে অবরোহক্রমেই চেতনার পরিণাম ঘটছে।

তাইতে প্রভাস-মানস একটা সহজস্থিতির ভূমি হতে পারে। দিব্য-জীবনের সমস্ত সাধনারই যে এই রীতি, এ-কথা কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে। যে-জাগ্রৎকে আমরা নিশ্চিত প্রত্যয়ের ভূমি বলে মানি, তাকে বিলুপ্ত না করেই তার মধ্যে লোকোত্তরের আলো আর শক্তিকে নামিয়ে আনতে হবে—এই হল সাধনার লক্ষ্য। যেমন এই প্রাকৃত-মানসই চিন্নাসিত (spiritualised) এবং শুদ্ধ সামান্যভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে উত্তর-মানসকে আবিষ্কার করে তার উৎসরূপে, তেমনি উত্তর-মানসও প্রাকৃত-মানসকে অবিলুপ্ত রেখেই তার উজানে আবিষ্কার করে প্রভাস-মানসের সংবেগকে। জ্যোতির্ময় ভাবনা বিদ্যাশক্তির স্বাভাবিক পরিপাকে খুঁজে পায় তার জ্যোতিরুৎসকে এবং ভগীরথের মত তাকে নামিয়ে আনে এই পার্থিব-জীবনের বুকে। তার ফলে এক যাদুভাস্বা আলোর প্লাবনে মন ইন্দ্রিয় প্রাণ এমন-কি দেহের মর্মকোষ পর্যন্ত বিদ্যুদ্বীর্যে প্রস্ফুল হয়ে ওঠে। বাইরের আলো আর ভিতরের আলো তখন একাকার হয়ে যায়, চিদাকাশে এক নিত্যসূর্যের অন্তহীন উদয়নে আর্যপ্রতিভার দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—বহু বেদমন্ত্রে আমরা পাই যার সমৃদ্ধ বাণীরূপ।

প্রভাস-মানসের উজানে হল বোধি-মানস। উত্তর-মানসের দিব্যমনন আর প্রভাস-মানসের দিব্যদর্শন—দুয়েরই সে উৎস। চেতনার স্বাভাবিক রীতিতেই তার স্ফুরণ হয় ভাবের গাঢ়তায়। যদি কোন প্রাকৃত ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করে তার স্বরূপ বুঝতে হয়,

তাহলে বলা চলে বোধি-মানসের সংবিৎ যেন স্পর্শের সংবিৎ। আবার সেই ভালবেসে জানার কথাই তুলি। চোখের দেখায় বাইরে যাকে পেয়েছিলাম, ভাবের উল্লাসে তাকে পেলাম অন্তরে। তারপর আমারই বুকের আলোয় গড়ে উঠতে দেখলাম তার ভাবঘন প্রতিমা। এই দেখা আরও নিবিড় হয় স্পর্শে—যখন হৃদয়ের আলো দিয়ে ঐ আলোর মানুষটিকে জড়িয়ে ধরি। এই স্পর্শযোগে শুরু হয় চেতনার নতুন বিলাস। রূপ হতে চেয়েছিল স্পর্শের আকৃতি; এবার সেই স্পর্শই যেন রূপের শরীরে তোলে নতুন ঢেউ, আর সেই রূপোল্লাস অকল্পা ভাবনার বিদ্যুতে বারবার ঝিকিয়ে ওঠে। আরোহক্রমে যা ছিল আকৃতি, এবার অবরোহক্রমে তা-ই হয় বিসৃষ্টি। ভাব চেয়েছিল রূপকে, রূপ স্পর্শকে; এবার স্পর্শের মাধুরীই ফোটে রূপ হয়ে, আর সেই রূপ উৎসারিত করে ভাবকে। যাঁরা রসের সাধক, চিৎপরিণামের এ-রীতি তাঁদের অজানা নয়। আলঙ্কারিকের ভাষায় স্পর্শ এখানে 'বিগলিত-বেদ্যান্তর'—অন্তরঙ্গ অনুভবের নিবিড়তায় আর-সব জানাকে গলিয়ে সে পর্যবসিত করেছে একরস প্রত্যয়ে। এমনি করে জানা হল একেবারে আপন করে পাওয়া। বোধি তাই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের সহজ বৃত্তি।

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাঝেও বোধির আবেশ আছে বলে তাকে আমাদের এত নিশ্চিত মনে হয়। যা চোখে দেখেছি বা হাতে ছুঁয়েছি, তার প্রামাণ্যের উপর আর কথা চলে না। কিন্তু তবুও প্রত্যক্ষের বিষয় সেখানে বিষয়ীর বাইরে পড়ে থাকে, তাইতে দেখে বা ছুঁয়েও যে বিষয়কে আমরা পুরাপুরি জানতে পেরেছি একথা বলা চলে না। জানার এই শূন্যতা পূরণ করে ভাব। ভাবের মাঝে যে বোধির আবেশ তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের চাইতেও অন্তরঙ্গ। তাইতে বাইরে পাওয়ার চেয়ে অন্তরের পাওয়া যে আরও নিবিড় আরও সার্থক হয়, একথা আগেই বলেছি। ভাবের পাওয়াতে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ ঘুচে যায়, বিষয়কে বিষয়ী জানে তারই আত্মস্বরূপের বিভূতি বলে। এই জানাকেই আমরা আগে বলেছি 'হয়ে জানা।' প্রাকৃত জগতেও এই 'হয়ে জানার' দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমবেদনা তার একটী সর্বজনীন এবং সুপরিচিত রূপ। সমবেদনা যে শুধু সমানে-সমানেই হয়, তা নয়। কবির হৃদয় নিষ্প্রাণের মাঝেও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে এই সমবেদনা দিয়েই। বৈজ্ঞানিকের মনীষা বহিরঙ্গ বিশ্লেষণের (analysis) পথ ধরে বলে এই অন্তরঙ্গ সংশ্লেষণের (synthesis) পথকে উপেক্ষা করতে পারে বটে। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণ দুয়ে মিলে তবে জানার পূর্ণতা। বুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু না করে হৃদয় যদি তার সঙ্গে যোগ দেয়, তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং সার্থকতা বাড়ে বই কমে না। বুদ্ধিও জানে অন্তরাবৃত্তি এবং তন্ময়তার দ্বারা। বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্তের তন্ময়তার গভীরে 'ধপ্ করে' জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, এ-তথ্য বৈজ্ঞানিকেরও অগোচর নয়। অর্থাৎ বিশ্লেষণের পন্থা-

তেও জ্ঞানের প্রসার ঘটে বোধিবৃত্তিরই সহায়ে। প্রাচীন যোগীরা এই তথ্য জানতেন বলেই ধারণা-ধ্যান-সমাধিযুক্ত 'সংযমকে' অলৌকিক বিষয়জ্ঞানেরও দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের একটা স্থূল উপায়ই আমাদের জানা আছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষের সীমানাকে যে প্রসারিত করা চলে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিৎ যে একেবারে অসম্ভব নয়, একথা আধুনিক মনো-বিজ্ঞানেও স্বীকার না করে পারছে না।

তবে কিনা প্রাকৃত-মনে বোধির আলো স্বচ্ছ হয়ে ফোটে না সবসময়। তার কারণ হল প্রাকৃত-মনের ইন্দ্রিয়নির্ভরতা এবং বাসনার মালিন্য। অন্তর্মুখ স্বচ্ছ এবং প্রশান্ত চিত্তে বিষয়ের অর্থের জ্ঞান যে ভিতর হতে আপনি উৎসারিত হয়, এ-অনুভব তো বিরল নয়। অন্তরাবৃত্তির অনুশীলনে চিত্ত যোগভূমিক হলে বিষয়ের ধর্মের (properties) জ্ঞানও যে অসম্ভব নয়, একথার ইঙ্গিত আগেও করেছি। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বোধির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। যোগীর বাক্‌সিদ্ধি বা প্রাকাম্যকে (irresistiblity of will) বোধির স্ফুরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করাও চলে। রাগদ্বেষহীন প্রশান্ত চিত্তে অবাস্তব কল্পনার উদয় হয় না, বস্তুত যা ঘটবে তারই ছবি ফুটে ওঠে। বলা বাহুল্য, চিত্তে সেখানে মনন বা অনুমানের কোনও ক্রিয়া থাকে না। ঘটনায় শক্তির যে-ব্যাপ্রিয়া থাকে যোগ্য যদি তার নিমিত্ত হন, তাহলে তাঁর সিদ্ধিতে ফোটে বোধির ক্রিয়ারূপ। অবশ্য জ্ঞান আর ক্রিয়া সেখানে অবিনাভূত। যা ঘটছে তা বস্তুস্থিতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবেগেই ঘটছে, যোগীর বোধি আত্মসত্তায় সে-প্রবেগকে অনুভব করছে মাত্র।

আমাদের সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির মূলেই রয়েছে তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের (knowledge by identity) প্রেরণা। সব জানাই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় বিষয়কে নিজের মত করে জানাতে, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়াতে। এই তাদাত্ম্যবোধই হল বোধির বিশিষ্ট লক্ষণ। আত্মানুভবকে জাগ্রত রেখেই বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যে-একাত্মতা, তাইতে তাদাত্ম্যবোধের চরম সার্থকতা। তন্ময় হয়ে বিষয়কে জানছি, কিন্তু নিজেকে হারিয়ে নয়। আবার জানাতে আত্মবোধ এবং বিষয়বোধ দুইই উদ্ভাসিত থাকছে। এ ঠিক নিরোধযোগ নয়, যদিও চেতনার অন্তরাবৃত্তি আছে বলে নিরোধের সংস্কার যে এখানে একেবারে নাই, তাও নয়। একে জাগ্রৎ-সমাধির অবস্থা বলা যেতে পারে।

বোধের দুটি প্রান্তকে এমনি করে যুগপৎ জাগিয়ে রাখতে হলে তৃতীয় একটি সত্তার আবেশ দরকার হয়। এই সত্তা হল 'ভূমা'—আকাশবৎ এক মহাবৈপুল্যের বোধে আমরা যার পরিচয় পাই। জাগ্রৎ-চেতনায় আনন্ত্যের বোধকে নিরন্তর বহন করাই যে পূর্ণযোগের প্রথম সাধন, একথা আগেও বলেছি। এও বলেছি, এই ভূমা বা আনন্ত্যের বোধকে পেতে হবে সহজ হয়ে, কোনও কসরত করে নয়। ফুল যেমন আলো-বাতাস-আকাশকে পায়,

পাপড়ি খুলতেই অলীনের ছোঁয়ায় সুরভি হয়ে ওঠে, তুনাকে পেতে হবে তেমনি করে। আলো ঝরে পড়ছে আর হৃদয়ের কমল নিত্যকাল ধরে নিজেকে মেলেই রেখেছে তার পানে : এ-ব্যাপারটি ঘটে চলেছে সত্তার গভীরে। কমল দল মেলছে। তুনার আবেশে তার সবটুকু ফুটছে আলো হয়ে। ঘটছে শুদ্ধসত্ত্বেরই সহজ পরিণাম, যেমন ঘটে থাকে চৈত্য-রূপান্তরে। যা আভাস ছিল, তা-ই হল প্রভাস। আত্মসত্তার সুগভীর প্রত্যয়ই ফুটল দৃষ্টির উল্লাস হয়ে, ফুটল ঝলকে-ঝলকে দিব্যভাবনার বিচ্ছুরণ হয়ে। স্বানুভবই হল দৃষ্টি, আবার সেই দৃষ্টিই হল সৃষ্টি—যেমন হয় কবিহৃদয়ের কাব্যে রূপায়ণে। অলখের ছোঁয়ায় সত্তার গভীর হতে এমনি করে আত্মবিভূতির উৎসারণই হল বোধি-মানসের ব্যাপ্রিয়ার (functioning) রীতি।

এই ব্যাপ্রিয়ার চারটি বিভাব আছে, তাদের বোধির স্বাভাবিক বৃত্তি বলতে পারি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংজ্ঞা অনুসারেই তাদের নাম দিতে পারি—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন ও মনন। প্রাকৃতভূমিতে ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারেই যে বোধির পরিচয় সবচাইতে স্পষ্ট একথা আগেই বলেছি। যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মতই সুস্পষ্ট এবং অবাধিত অথচ যার নিদান বাইরের বস্তুতে নয় কিন্তু গভীর আত্মপ্রত্যয়ে, তা-ই হল বোধির স্বাভাবিক বৃত্তি।

অনুভবের সূক্ষ্মতা অনুসারে বৃত্তিগুলিকে পরপর সাজানো যেতে পারে। তখন বোধি-মানসের সবচাইতে সূক্ষ্ম বৃত্তি হবে সত্য-শ্রুতি। এই বৃত্তির গ্রাহ্য বিষয় হল 'বাক্'—যার কথা নানাভঙ্গিতে সবদেশেরই মরমীয়ারা বলে গেছেন। এদেশের বৈদিক-মীমাংসায় এবং তন্ত্রে বাকের রহস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। তার মূল কথা হল, বাক্ আকাশের স্পন্দ। শূন্যের মাঝে উন্মিষন্ত সত্তার যে আদ্য-স্পন্দ, তা-ই বাক্। বোধির যে অন্তর্মুখ বৃত্তি তার গ্রাহক, তা-ই হল শ্রুতি।...অরূপ বাকের গভীরে রূপায়ণের যে-আকুতি, সিসৃক্ষার যে-সংবেগ—উপনিষদের ঋষি যাকে বলেছেন প্রাণ—তারই গ্রাহক হল বোধির স্পর্শবৃত্তি। এই স্পর্শ হল প্রাণ দিয়ে প্রাণকে ছোঁয়া, যে-প্রাণের মাঝে রূপায়ণের সামর্থ্য টলমল করছে। এই সামর্থ্যকে স্পর্শ করাই হল যে-কোনও বস্তুর মর্মসত্যকে স্পর্শ করা এবং তার অবরুদ্ধ সম্ভাবনাকে মুক্তি দেওয়া। মাতৃহৃদয়ের স্পর্শ যেমন সন্তানের নিগূঢ় সত্তাকে উন্মেলিত করে তার স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলে, এও তেমনি।...তারপর প্রাণের আকুতি নীরূপ ভাবকে দেয় রূপ, আকাশেরই আত্মপ্রতিবিম্ব ফোটে জ্যোতিতে, স্পর্শের রোমাঞ্চ যেন অনন্তবিধার আলোয় নীহারিকায় ঝলমলিয়ে ওঠে। বোধির দর্শনবৃত্তি হল এই জ্যোতির গ্রাহক। বলা বাহুল্য, এ-দর্শন প্রাকৃত-দর্শনের মত বাইরের বস্তুর সংঘাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজন এবং তার ফলে নিজের বাইরে বস্তুকে দেখা নয়। এ হল উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে 'আবৃত্তচক্ষু হয়ে নিজেকেই সামনাসামনি দেখা' এবং সেই আত্মদর্শনের উল্লাসকেই

রূপান্তরিত করা বস্তুর বিসৃষ্টিতে এবং দর্শনে। বরনীয়া বলেন, যিনি আত্মারাম, তিনি নিজের মাধুরীকে আস্বাদন করবার ইচ্ছাতে তাকে প্রতিক্ষিপ্ত (projected) করে 'ঈক্ষণ' করলেন অর্থাৎ দেখলেন। বোধির দর্শন এমনিতর ঈক্ষণ—কবি যেমন তাঁর ভাবময় আত্ম-সত্তাকে প্রতিক্ষিপ্ত করে ঈক্ষণ করেন, তেমনি।

বোধির এই তিনটি বৃত্তির আমরা নাম দিয়েছি প্রাকৃত বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তির নাম অনুসারে। কিন্তু স্পষ্টই দেখছি, দুয়ের মাঝে মিল শুধু বিষয়ের অপরোক্ষতায়, নইলে বোধির বৃত্তি আর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধারা একেবারে পরস্পরের বিপরীত। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষে আমরা বাইরের বস্তুকে ভিতরে আকর্ষণ করি : আমাদের অনুভব যে সত্য, তার নৈশ্চিত্য থাকে বস্তুতে। আর বোধির প্রত্যক্ষে আমরা ভিতরের ভাবকে বাইরে প্রতিক্ষিপ্ত করি : অনুভবের সত্যতা সেখানে নির্ভর করে আত্মপ্রত্যয়ের উপরে।

এই-যে বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ, এ-দুয়ের সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মনের জগৎ। মনন ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের উজানে, চোখের দেখার ওপারে হল মনের দেখা। আবার মনন বোধিজ-প্রত্যক্ষের ভাটিতে, ভাবের দেখাই রূপ নেয় মননে—ভাবকে হয় নিজের কাছে কিংবা পরের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর করবার জন্য। ভাব আত্মানুভবের সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে ছিল, আত্মবিচ্ছুরণের প্রবেগে তা বাইরের দিকে ঠিকরে পড়ল। তখন আমিই যেন আমাকে দু'ভাগে ভাগ করলাম,—আমার একভাগ হল বিষয়ী, আরেক ভাগ হল বিষয়। অখণ্ড অনুভবকে এমনি বিভাজিত করে চেতনার যে-বৃত্তি তাকে বলে 'বিবেক' (discrimination)।

বোধির এই আত্মবিবেক হতেই জাগে দিব্য-মনন, যা বোধির স্বাভাবিক বৃত্তির মধ্যে চতুর্থ। সত্যের শ্রবণ স্পর্শন আর দর্শন হতেই তখন জাগে সত্যের মনন - ঠিক যেমন প্রাকৃত-ভূমিতে ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষ হতে প্রাকৃত-মনন জাগে। কিন্তু প্রাকৃত-মননের ধারা হল আরোহী, আর বোধিজ-মননের ধারা অবরোহী। বোধি মনকে তখন ব্যবহার করে যন্ত্ররূপে। সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে এক 'মহৎ তত্ত্ব' হতে তখন মনের উৎপত্তি হয়। সে-মন শুদ্ধ, ছন্দোময়, ক্রিয়াচারী। প্রাকৃত মন জাগে ইন্দ্রিয়ব্যাপার হতে, ইন্দ্রিয় জাগে ভূতের ব্যাপার হতে : সে-মনের ক্রিয়া মন্থর, চঞ্চল, অবিশুদ্ধ। মানসভূমিতে এই শুদ্ধ মন আর অবিশুদ্ধ মন পাশাপাশি থাকে। তাইতে ওপার হতে আলোর ঝলক আসে, কিন্তু এপারের ধোঁয়ায় তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অনুভবের ধারাকে যদি আমরা উলটে দিতে পারি, অর্থাৎ বাইরের চাপে না দেখে ভিতরের প্রেরণায় দেখতে শিখি, জীবনকে বস্তুনির্ভর না করে মুখ্যত ভাবনির্ভর করি, তাহলে বোধিজ-মননের ক্রিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

বোধি-মানসের ভূমিতে উত্তীর্ণ হলে পর প্রভাস-মানস আর উত্তর-মানসের ক্রিয়া যে

অনায়াস হবে একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুত উত্তর-মানসে আমরা স্বরূপত পাই বোধিজ-মননেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। আর প্রভাস-মানসে তত্ত্বত কাজ করে বোধিজ-প্রত্যক্ষেরই বৃত্তি। উত্তর-মানস প্রাকৃত-মানসের কাছাকাছি, তাই মননবৃত্তিই তার মাঝে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই মনন প্রভাস-মানসের মাঝে গোড়ে একটা দিব্য-প্রত্যক্ষের আশ্রয়। তখন চেতনার ধাতুরও (stuff) একটা রূপান্তর ঘটে। উপনিষদের ঋষি এই রূপান্তরকে বলেন 'প্রসাদ' (transparency)। প্রাকৃত মনের রাজ্যে যে আবছা আলো, উত্তর-মানসে তা ফোটে জ্যোছনা হয়ে এবং প্রভাস-মানসে সৌর-দীপ্তি হয়ে। চিত্তের উপাদান তখন 'তেজস্বী' হয়। এই তেজেরও ঊর্ধ্বে যে প্রাণ আর আকাশের একটি নিপুন আছে, তারই মাঝে হল বোধি-মানসের প্রতিষ্ঠা। বোধি-মানসের মাঝে বলতে গেলে দিব্যধাতুর প্রসাদ চরমে ওঠে এবং তা প্রাণে ইন্দ্রিয়ে ও দেহ চেতনাতেও উত্তরজ্যোতির বীর্য আর দীপ্তিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা যেতে পারে ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠার চরম ভূমি।

বোধি-মানসের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং বর্মভেদী। মন এবং প্রাণের মাঝে অবিদ্যার যেসব গ্রন্থি থাকে, বিদ্যুতের অভিঘাতে খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেগুলোকে সে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু তবুও তার শক্তি সীমাবদ্ধ, অচিতির গভীরে আঘাত হানতে গিয়ে সেও কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে। তাই আধারের সম্যক্ রূপান্তর সিদ্ধ করবার জন্য যেতে হয় বোধিমানসেরও উজানে—অধিমানসের ভূমিতে। এইবার তার কথা বলব।

[ক্রমশঃ]

উর্বশী

শ্রীঅরবিন্দ

১

নারী-চরিত্র বর্ণনায় যেমন কালিদাসের নাট্য-প্রতিভা অনায়াস সিদ্ধির বলে সর্বত্র অনিন্দনীয় এক নমনীয়তা ও স্নিগ্ধ কমনীয়তার শতদল মেলে ধরে এমন আর কোথাও নয়। তিনি হয়ত সর্বদা তাঁর গৌণ নারী-চরিত্রগুলি পূর্ণপ্রস্ফুটিত করে তোলেন না, তবে তাঁর হাতে ক্ষণিকের জন্য আসা সামান্য স্ত্রীচরিত্রটিও আপন ব্যক্তিত্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভীড়ের মধ্যে তারা হারিয়ে যাবার মতো নয়, শুধু নামসর্বস্ব তো নয়ই। নাট্যকারের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় হলেও নারীচরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি বস্তুটি একান্তই বিরল। সাধারণত কোনো কবি নিপুণভাবে আঁকতে পারেন শুধু সেসব চরিত্রই যারা পরিচিত, কিম্বা যাদের স্বভাব কবির নিজের স্বভাবের সঙ্গে মেলে; তার চেয়ে আরো সহজ হয় আঁকা কোনো একটি অস্বাভাবিক চরিত্র। শেক্সপীয়র এদের কোনোটিরই ধার ধারেন না। যেমন—ক্লিওপেট্রা, ভিওলা, কোরোয়োনাস, বেয়াত্রিস যোয়ানুয়াস। ব্যাসদেব এবং সোফোক্লিসের নারী-চরিত্রেরা মনে হয় এক গোত্রের: একটা স্থির আত্মস্থ পুরুষালী সামর্থ্যই বলে দেবে তারা এক জাতের। অন্য কবিদের ক্ষেত্রে দেখব সাফল্য একটিমাত্র স্ত্রীচরিত্র চিত্রণে, অন্য চরিত্র-গুলি প্রায়শ এই প্রধান চরিত্রেরই প্রতিচ্ছায়া—তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কোথাও কোথাও কবিরা প্রায়শ স্ত্রীচরিত্র চিত্রণ করেন দূর থেকে। যে সকল কবি স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির বলে নারীচরিত্রের যথার্থ মর্মরহস্য ধরতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এ-বিষয়ে এবং নাটকের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে শেক্সপীয়রের প্রতিভা অদ্বিতীয়—আর, প্রসারের দিক দিয়ে নয়, তবে গভীরতার দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন একমাত্র বাল্মীকি। একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বাসীনও দেখিয়েছিলেন এই প্রতিভা, কিন্তু কালিদাসে কোনো সীমা নেই—যদিচ কালিদাসে আবার নেই শেক্সপীয়রের যথেষ্ট প্রাচুর্য ও সংকেত বৈচিত্র্য। আর কারো নাম মনে পড়ছে না। অবশ্য কয়েকজন কবি সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন গুটি সহজ চরিত্র, তবে তার মূলে ততখানি না অভ্রান্ত সাক্ষাৎ অন্তর্দৃষ্টি যতখানি পর্যবেক্ষণ। 'অগ্নিমিত্র' স্ত্রী-বর্জিত নাট্য—তার ক্ষেত্র অন্তঃপুর এবং রাজপুরীর প্রমোদ-উদ্যান: সেখান থেকে আসছে বসনের মৃদু-মর্মরশব্দ, অলংকারের ঝনঝনঝঙ্কারধ্বনি, কেশের গন্ধবাস, বামাকণ্ঠের স্বরমুগ্ধ। 'উর্বশী'তে চিত্রপটের অর্ধেকই

রাখতে হয়েছে নায়কের জন্য, সুতরাং নারীচরিত্রদের জন্য স্থানসংক্ষেপ করতে হয়েছে অনেকখানি—তবে যতটুকু অবকাশ সেখানে তার মধ্যেই কালিদাস এনেছেন অনিন্দ্যসুন্দর উদ্ভাসন সব শ্রীমূর্তি, তাদের প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারা অপ্সরা, আর উর্বশী তাদের মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকজনা। স্বর্গের এই অপ্সরাদের কায়া ও মাধুর্য বুঝতে হলে তাদের সৃষ্টির রহস্য ও অর্থ কিছু বুঝতে হয়।

তখন অনন্ত কালের অসীম বিস্তার। মানুষ ছিল তাহ্লাদো সজীব। নীল আকাশে আর তারাখচিত লক্ষ লক্ষ প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হল জ্যোতির্ময় দেববৃন্দ এবং মহাপরাক্রম অসুররা। তাদের দ্বন্দ্ব-প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে যখন দেখা দিয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ড তখন তারা সন্ধি করল, এক উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে এল মহাসমুদ্রের তীরে। এই উদ্দেশ্য শুধু এক দলের চেষ্টায় সফল হবে না ; ভালোকে এখানে মন্দের সঙ্গে মিলতে হবে, বাস্তবকে আদর্শের সঙ্গে, আত্মাকেএসে কাজ করতে হবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলে, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-মর্ত্য-নরককে একজোট হয়ে লক্ষ্যসাধনায় নামতে হবে ; কারণ এই অভিনব প্রয়াসের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা জীবনে যাকিছু সুন্দর, যাকিছু মধুর, যাকিছু অবিশ্বাস্য, যাকিছু জীবনকে কেবল প্রাণধারণের চেয়ে দেয় মহত্তর গৌরব, দেয় অবসর, সেই অপূর্ব চিন্তা যার স্পর্শ বারংবার এসে তরঙ্গ তুলেছে অবিশ্বাসীরও মনে, অসীম প্রয়াসের স্বপ্নকল্পনা যা মানুষকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়েছে উচ্চতার নব নব শিখরে, প্রগতি থেকে মহত্তর প্রগতির দিকে, যাতে শেষে দেহে এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পশু হয়েও নিজের অন্তরস্থ উন্নত অংশটি ধরে সে আকর্ষণ করতে পেরেছে সুদূরতম স্বর্গকে। তাই এবার তারা এসে মিলিত হল মহাসমুদ্রের তীরে—ভালো এবং মন্দর দল একত্র একলক্ষ্য হয়ে এসে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করল। বাসুকি বা বাসনা-সর্প হল রজ্জু আর তা দিয়ে বেষ্টন করে মন্থনের দণ্ড হল মন্দারপর্বত। এ-সমুদ্র আধ্যাত্মিক-জীবন-সমুদ্র, কল্পনা ও অভীপ্সার সমুদ্র, নিছক দেহ ও নিছক প্রাণের উর্ধ্বে মানুষের অন্তরে প্রসারিত যা তারই মহাসমুদ্র। মন্থনে স্ফীত হয়ে উঠল সমুদ্র, তারপর ক্রোধে গর্জন করে উঠল। বাসুকি ক্লান্ত নির্জীব হয়ে পড়ল, তার সহস্র ফণা ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালার উপর লুটিয়ে পড়ল, তার শিথিল জিহ্বা সমুদ্রের যন্ত্রণা-স্রোতের উপর ঢালতে লাগল গরলধারা। তা থেকে এক মহাগ্নির সৃষ্টি—সে-তাপে যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল বিশ্বচরাচর। এ জ্বলন্ত চিত্র দেখায় বিশ্বের বুকে যে বিষ, জীবনের যন্ত্রণা ও বীভৎসতা, যত দুঃখ নিষ্ঠুরতা হতাশা, অবিশ্বাস বিভ্রান্তি ক্রোধ, মত্ততা এবং মানুষের মধ্যে যাবতীয় পাশবিক ও পৈশাচিক বস্তু ; মানুষ যে অত্যাচার নিজের উপর, তার স্বশ্রেণীর অন্যান্যদের উপর ও দুর্বলের উপর অনুষ্ঠিত করে এটি তারই নগ্ন রূপ। এমন দারুণ অবস্থায় পড়ে দেবতারা উঠল গিয়ে নীরব নির্জন গিরিরাজের চিরতুষারাবৃত দুর্গম শিখরে, শরণাপন্ন হল সেই শঙ্করের যিনি নিজের

জটাজালের মধ্যে ধারণ করেছেন মর্ত্যগামিনী গঙ্গার অজস্র ধারা। সৃষ্টিকে বিধাতৃর হাত থেকে আর কে রক্ষা করতে পারে? ভস্মাচ্ছাদিত এই যোগীশ্বর, যিনি সকল শোক ও কামনার ঊর্ধ্বে, যাঁর কাছে ভীষণের ভয়ংকরতা ধ্বংসকর বস্তু ও দুঃখ যাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না, যিনি সকল আর্তি মুহ্যমানতা হতাশা বুকে টেনে নেন, তিনি ছাড়া ত্রাণ করতে পারে আর কে?

সমুদ্র থেকে তারপর উঠতে লাগল অপূর্ব সব জিনিস। উচ্চৈঃশ্রবা উঠল তার বীর্যব্যঞ্জক কেশর ফুলিয়ে হ্রেষারবে, পদক্ষেপে স্বর্গীয় সংগীতের তরঙ্গ তুলে সে এক নিমেষে অতিক্রম করে যায় সকল দূরত্ব। তারপর আবির্ভূত হলেন বরুণের (গ্রীক ভেনাস ঔরানিয়া) কন্যা বারুণী (গ্রীক ভেনাস আনাদিয়োমেনি)—পদ্মের উপর পদ্মযুগল রেখে দাঁড়িয়েছেন তিনি, মর্ত্যের জন্য তিনি আনলেন সৌন্দর্য, আনন্দ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য। দেববৈদ্য ধন্বন্তরী এলেন পাত্র হাতে—সব বেদনা তিনি উপশম করতে পারেন, হৃদয় থেকে গভীর ক্ষত নিশ্চিহ্নভাবে নিরাময় করে দিতে পারেন। তারপর কৌস্তুভমণি—তার নির্মল দ্যুতিতে ভরে যায় পৃথিবী, বিশ্ববিধাতার বক্ষে শোভিত এ রত্ন আর্ত ও শ্রমক্লান্ত দুই পক্ষের কাছেই লোভনীয় বস্তু।

২

এই হল নারায়ণের দেহসম্ভূত উর্বশী—সূর্যালোকের দীপ্তির মতো, উষার রক্তিমাভার মতো, সমুদ্রের কলকণ্ঠের মতো, অসীম আকাশের মহিমার মতো, বিদ্যুৎ-চমকের মতো, অর্থাৎ এক কথায়, এ বিশ্বে যাকিছু উচ্ছল, সুন্দর, অলভ্য ও একান্ত লোভনীয় সে তাই। আবার নর্তকীরূপে, নর্তকীজীবনে, মানুষের বাসনা ও আবেগের আনন্দে রয়েছে যা কিছু অপূর্ব, সুন্দর ও মুগ্ধকর সে-সবও সে। এ ছাড়া শিল্পে কাব্যে চিন্তায় জ্ঞানের মধ্যে যে বস্তুটি মোহিত করে, অভিভূত করে দেয়, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় তা সব পুঞ্জীভূত এই একটি নামের মধ্যে। কিন্তু কালিদাস তাঁর উর্বশীকে নয়নবিভ্রান্তিকর এমন দৃশ্য চাকচিক্যে আদৌ সজ্জিত করেন নি। তিনি উর্বশীকে চিত্রিত করেছেন শুধু প্রেমময়ী পরমাসুন্দরী নারীরূপে। একটা দ্যুলোকের আবহাওয়া, একটা সুদূরের জ্যোতি, অবাধ বাতাসের একটা মুক্ত নিঃশ্বাস আর চারদিকে অবশ্য রয়েছে, তবে সে-সব রয়েছে যেন তার পারিপার্শ্বিকী হিসাবে মাত্র—সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নয়। উর্বশী এখানে সরল সহজ মনোহারিণী নারী; যে বর্ণ সমাহারে এই রূপ চিত্রিত তা হল ভীরুতা, ঊষ্মা, নির্দোষ ব্যস্ততা, একটা সুন্দর বালিকাসুলভ অকৃত্রিমতা যা পরে পরিণত হয়েছে মাতৃত্বের স্থৈর্যে ও পূর্ণ-প্রস্ফুটিত

শতদলে, একটা প্রখর নির্মল অনাবৃত আবেগে। জননী, সহোদরা ও সখীরূপে অন্যের তার স্নেহ ও ভালবাসা। কণ্ঠের ভাষা তার অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত। এ-সব গুণই আদর্শ কুমারী ও আদর্শ নারীকে পরম মাধুর্যমণ্ডিত করে। তবে এ উর্বশীর নেই স্বর্গের দেবীসুলভ রাজকীয় ভঙ্গি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য, পায়ে তার ডানা নেই যা তাকে অপর সকলের চেয়ে উর্ধ্বে উড়িয়ে নেবে, কোনো মুখোশ দিয়েও ঢাকা নেই তার হৃদয়ের নানা ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত খেলা, নয়নে হাস্য, অকস্মাৎ অশ্রু, মধুময় মুখ, নিমীলিত আঁখিপল্লব, স্বভাবজাত মাধুর্য-মাখা দ্রুত ও অনায়াস দেহভঙ্গি। এই যদি স্বর্গের অপ্সরা, তবে বলতে হয় স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নেই। হরণ এবং উদ্ধারের দৃশ্যে তার আতঙ্ক ও মূর্ছা—যেখানে দেবী সম্বোধন দ্বারা চিত্রলেখা তার মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে—আদৌ অপ্সরাযোগ্য নয়। সহোদরার মতো ব্যগ্রতার সঙ্গে এই ইঙ্গিত ধরেই চিত্রলেখা বলে উঠেছে, "অনপ্সরের যে প্রতিভাসি"—সখি অপ্সরা বলে তো তোমাকে মনে হচ্ছে না। অপ্সরা না হলেও উর্বশী এখানে মানুষ, এমন অনুপমা যে প্রথম থেকেই আমাদের হৃদয় জয় করে বসে। তার প্রেমের একটা কোমলতা, তার হঠাৎ ভয়প্রাপ্তি, চকিত হতাশায় মুহ্যমানতা তাকে একান্তই মানুষী করে তুলেছে। তার মধ্যে ঈর্ষা জাগলেও তা ক্ষণিক ও ঔদার্যমণ্ডিত—পদশ্রীকাতর হীনতা তা নয়; পুরূরবার বিরহে তার অসংবৃত চিত্তবিক্ষোভের হঠাৎ বিস্ফোরণ, কিম্বা নিজের ভীরু স্বভাব থেকে জন্মিত একটা শঙ্কা তার নিজের রূপশ্রী সম্বন্ধে অনাস্থা ও অজ্ঞতা হিসাবেই দেখা দিয়েছে। এসব খুঁটিনাটি কালিদাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যাতে মনে হয় তাঁর একান্ত প্রয়াস যেন কোনো দুরভিমানী সমালোচক ও এই উর্বশীর মধ্যে স্বর্গীয় দেবসভার সুলক্ষণীর কোনো চিহ্ন খুঁজে না পায়। এখানে নেই জাঁকজমক, ঐশ্বর্যের ঝলক, দেবসভাশোভিনীর যত্নকৃত প্রলোভনভঙ্গি: এখানে দেখি অন্তরাত্মার স্বর্গীয় সারল্য ও শুভ্র স্বচ্ছতা। এই উর্বশীর অকপট ও আবেগোচ্ছল প্রেমের উৎসও একটা আন্তরিক পবিত্রতা ও উন্মুখিতা। গোপনে অপটু, অসাবধানী, স্পষ্টভাষিণী সে এক এক সময়ে এমন দারুণ খেয়ালী যে তার নিবিঘ্ন পথে কোথা থেকে অহেতুক এই দেখা দেয় বাধা, ফলে নিজের সামর্থ্যের উপরই তার আস্থা যায় হারিয়ে। এই উর্বশীই আবার হয়েছে মাধুর্যময়ী মহীয়সী, এমন কি, আভিজাত্যমণ্ডিত—দৃষ্টান্তস্বরূপ, তৃতীয় অঙ্কে তার কয়েকটি কথাবার্তা, চতুর্থ অঙ্কে পুরূরবার সঙ্গে মিলনকালে এবং পঞ্চম অঙ্কে সর্বত্র যখন তার পরিচয় স্ত্রী ও জননীরূপে—এখানে পূর্ববর্তী দৃশ্যসমূহের বালিকাসুলভ চাপল্য, অস্থিরতা এবং খেয়ালীপনার অবসান তার মাধুর্যকে করে তুলেছে আরো গভীর। অনেক অতিপটু ভাষ্যকার এই উর্বশীর মধ্যে দেখেছেন দেবসভার অধিবাসিনীকে—আমি তা আদৌ দেখি না; নাটকের এই পরিধির মধ্যে কালিদাস যতখানি অবকাশ দিয়েছেন তার মধ্যে উর্বশী একান্তই

অপরূপ, নিষ্কলঙ্ক, এমন কি, নগ্ন। অন্তত, তাকে ক্লান্ত বলা যায় না। অবশ্য শকুন্তলা কিম্বা মালবিকার চেয়ে তার ভালোবাসা অনেক বেশি স্পষ্ট ও লীলাচপল, কিন্তু সেবীকে কিছুটা স্বাধীনতা দিতেই হয়—তাই তার ভাবভঙ্গিতে অতিরিক্ত সঙ্কোচ, যাতে অত্যুৎসাহী প্রণয়ীর মনে না হয় তাই পদে পদে সহজেই তার বাধা। পুরুরবার সম্মুখে যেন অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ আবির্ভাব এবং তাতে পুরুরবার দৃষ্টি আকর্ষণ না হবার দরুণ তার ক্ষোভসঞ্চারের চেয়েও এখানে আরো কয়েকটি মধুরভাবের ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। এই একই দৃশ্যে প্রিয়-আলিঙ্গনের পক্ষে তার অর্ধ-কৌতুকভরা অর্ধ-গম্ভীর আত্ম-সমর্থন এবং রাজার তিরস্কারে তৎক্ষণাৎ লজ্জানম্র নীরবতা তার চরিত্রের সরাধ আবেগপ্রবণতা এবং নম্র ভীরুতাকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। কালিদাস চরিত্র-চিত্রণ করেছেন এই সব প্রায়-অদৃশ্য রেখিকার ইন্দ্রজাল দিয়ে, কালিদাসের মার্জিত রুচি বলেছে এই সব অর্থপূর্ণ সামান্য খুঁটিনাটিই জীবন্ত চরিত্রের মুখ্য উপাদান। অবশ্য উর্বশীর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল স্নেহ ও প্রেমে তার আন্তরিকতা। কবি সর্বদা সতর্ক যেন কোথাও তার কথাবার্তায় আড়ম্বর, বাচলা বা অতিশয্য না এসে পড়ে; তার সহজ, সরল, আন্তরিক ভাষা ইলাবংশায় বীরের কাব্যময় অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষার একেবারে বিপরীত। তার ভাষা সর্বদা সরল ও সাধারণ হলেও সে নির্ভুলভাবে যে স্পষ্টগ্রাহ্য সহজ জিনিসটি বলে তা ঠিক অন্য একজন অনতি-অসাধারণ নারীও ঐ অবস্থায় তার স্বাভাবিক স্নেহবশে বলবে; বস্তুত তার ভাষা আশ্চর্য স্বাভাবিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয়ুকে পুরুরবা যখন স্নেহসম্ভাষণ করছে তখন সে একটা আধ-ঈর্ষার ভাবে অস্ফুটস্বরে বলছে, "কে এই কুমার" —কো নু খলু এষ সবাণাসনঃ পাদপীঠে স্বয়ং মহারাজেন সংযম্যমানশিখণ্ডকবিভূষিতি—যার কেশপাশ দিয়ে মহারাজ স্বয়ং চূড়া বেঁধে দিচ্ছেন? তারপর সত্যবতীকে দেখে সব সন্দেহের অবসান। কিন্তু এখানে মাতৃহৃদয়ের প্রকট আবেগময় আনন্দোচ্ছ্বাস নেই। "প্রায়ং মে পুত্রক আয়ুঃ। মহান্ খলু সংবৃত্ত—এই আমার পুত্র আয়ু, কত বড় হয়েছে সে!" এইটুকুই মাত্র, তবে ওর চেয়ে সত্য ও সুন্দর আর কিছু হতে পারত না। তবে আপাত-প্রতীয়মান নিরুচ্ছ্বাস সত্ত্বেও উর্বশীর প্রত্যেকটি কথা সুন্দর, সে সৌন্দর্য একনিষ্ঠ অকপট অন্তর থেকে উৎসারিত। পুরুরবার প্রতি তার প্রেমও কত খাঁটি তা তার এই প্রথম "উপকৃতং খলু মে দানবৈঃ—দানবগণ, তোমরা আমার যে কী উপকার করলে।" ও শেষ দিকের "অহো, শল্যমিব মে হৃদয়াদপনীতম্—বাঃ, আমার হৃদয় থেকে শলাকাটি যেন বহিষ্কৃত হল।" কথাই প্রমাণ। যে ভাবেরই হোক তার কোমল কথায় সর্বদা রয়েছে একটা সারল্য ও বাস্তবতা। চিত্রলেখা এবং অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে তার এই কথা, "সখ্যঃ, এত পাণ্ডিত্যং পরিষ্বজধ্বম্—সখি, আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরো" থেকে শেষ বিদায়ের "সখি, মা খলু মা বিস্মর—সখি, আমাকে ভুলে যেওনা" অনুরোধ পর্যন্ত ভাষা কোথাও

আবেগভরে সখীস্নেহার্দ্র, আবার কোথাও কোমলতা ও নির্ভরতাহীনা স্বচ্ছ ও উদ্ভ্রান্ত।

ইয়ং তে জননী প্রাপ্তা ত্বদালোকনতৎপরা।
স্নেহপ্রস্রবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্॥

একাগ্র দৃষ্টি মেলে পুত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে সে এখন জননীরূপে—স্নেহসুধারস-সিক্ত বক্ষ তার উদ্বেলিত হয়ে উঠছে সন্তানের প্রতি।

তাপসীর কাছে তার বিদায়-ভাষণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—গভীর ও গাঢ় বন্ধুত্ব প্রকাশের আদর্শ হিসাবে। স্বীকার করতে হয় উর্বশী-চরিত্র শকুন্তলার মতো নহৎ ও পূত নয়, তবে এও স্বীকার করতে হয় যে সৌন্দর্য ও নারী প্রকৃতির মাধুর্যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোনো নায়িকার চেয়ে কোনো অংশে সে হীন নয়।*

* মূল ইংরাজী থেকে অনূদিত।

কবি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যসৃষ্টির আলোচনা সহজ নয়, আমার মত এবিষয়ে অল্পপঠিতি ও অল্পশ্রুতির পক্ষে তো নয়ই বহুশ্রুতির পক্ষেও সহজসাধ্য নয়, কেননা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে গোড়া থেকেই দর্শনচিন্তা ও যোগভাবনার অন্তর্ধায়ী যোগ ছিল। অন্তর্ধায়ী বলছি এই কারণে যে শ্রীঅরবিন্দ যোগমার্গে অগ্রসর হবার অনেককাল আগে কবিতারচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এবং তখন থেকেই তাঁর কাব্য-রচনার সূত্রপাত। তাঁর গোড়ার দিকের কোন কোন কবিতায় (যেমন Love and Death এবং Urvasie) ইংরেজ কবি ষ্টিফেন্ ফিলিপ্‌সের প্রভাব পড়েছিল। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা আলোচনা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবনের কবিকৃতির মধ্যে Urvasie ও Love and Death এই কবিতা দুটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। Love and Death লেখা হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর বয়স সাতাশ। Urvasie লেখা হয়েছিল এর কিছু কাল আগে। কবিতা দুটি ভাব ও ছন্দের দিক দিয়ে অসামান্য। ছন্দ ইংরেজি Blank Verse; এই ছন্দের প্রয়োগে তিনি যে সূক্ষ্ম বোধ ও শ্রুতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার মূল্য অভিজ্ঞেরা স্বীকার করেছেন। ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখব যে কবিতা দুটিতে শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী জীবনে যে জীবনভাবনা ও জগৎদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তার পূর্বাভাস তখনি পড়েছে। তাঁর বিশেষ ভাবনা ও দর্শন চিন্তাকে স্বীকার না করলে শুধু এই কবিতা দুটির কেন, তাঁর কোন কবিতারই সম্পূর্ণ মর্মবোধ হবে না।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনভাবনা ভারতীয় জীবনভাবনার মূল উৎস থেকে উৎসারিত। এ ভাবনার সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবনভাবনার পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য যে কী তা তাঁর নিজের কথাতেই বলি। "আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্ত-র্মুখী, য়ুরোপের জীবন বহির্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কর্মকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁর অন্বেষণ করি, য়ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁকে দেখে ও উপাসনা করে।" শ্রীঅরবিন্দের কবিজীবনের মূলে ছিল এই অন্ত-র্মুখী জীবনচিন্তা। কিন্তু তাই বলে যদি Urvasie ও Love and Death কবিতা দুটিকে

অধ্যাত্ম কবিতা বলে মনে করি তবে ভুল করব। কবিতা দুটি কবিতাই এবং প্রেমের কবিতা। তবে শুধু প্রেমের কবিতা নয়, যে প্রেম বিচ্ছেদের মহৎ দুঃখ বরণ করে মৃত্যুকে পশ্চাদ্ধাবন করে অমৃতের পরপারে গিয়ে সমুত্তীর্ণ হয়, সেই পরমতম প্রেমের কবিতা।

দুটি কবিতার কাহিনীই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে নেওয়া। উর্বশীর কাহিনী ঋক্‌বেদে আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, কালিদাসের কাব্যে আছে। **Love and Death** -এর উপজীব্য রুরু-প্রিয়ম্বদার উপাখ্যানের কীর্ণ সূত্র পুরাণ থেকে নেওয়া। বলা বাহুল্য কবিতা দুটিতে কাহিনীর ভার নেই, কবির চিত্ত কাহিনীর ছায়াকে অবলম্বন করে কায়া ধারণ করেছে।

উর্বশী কবিতায় প্রেম প্রথমে হল অসার্থক, বিচ্ছেদের বাধা হল দুস্তর। সে বাধাকে কাটিয়ে মনোময় প্রেম শেষে বিজয়ী হল। প্রেম ও মৃত্যু কবিতায় প্রেম সার্থকতার সন্ধান পাবার আগেই মৃত্যু টেনে দিলে ছেদ। নায়ক রুরুর প্রেম সে ছেদ মানলে না, তা নিয়ে গেল তাকে মৃত্যুর পুরীতে ছায়ার বাধা কাটিয়ে প্রিয়ম্বদার সন্ধানে। পরিশেষে তা হল বিজয়ী। প্রেমের কাছে মানুষের মানস-অভিযানের কাছে মৃত্যু হার মানলে।

পুরুরবা-উর্বশীর প্রেম নরনারীর প্রেমের চিরন্তন প্রতীক। এ প্রতীককে শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করেছিলেন মানুষের অধ্যাত্ম-মহাযানেরও প্রতীক রূপে। তাই তিনি শুধু **Urvasie** কবিতাটি লিখেই ক্ষান্ত হন নি। এ কাহিনী তাঁর কবিচিত্তকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে তিনি **Love and Death** কবিতা রচনা করবার ক-এক বছর পরে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকটাই অনুবাদ করলেন **Hero and the Nymph** নামে। এ অনুবাদ এতই চমৎকার যে একে অনুবাদ না বলে নতুন রচনা বলতে ইচ্ছা হয়।

মানুষের প্রেম, মানুষের অনাদ্যন্ত অধ্যাত্মজীবন জীবনমৃত্যু অধিকার করে, তার বাইরে এপারে ওপারে সীমাহীন কালচেতনার উর্ধ্বে প্রবাহিত—এই অনুভবের যে অস্পষ্ট প্রকাশ **Urvasie** ও **Love and Death** কবিতা দুটিতে পাই তারই পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ বোধ শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রীতে অভিব্যক্ত। এ কাব্যটির কাহিনীও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে নেওয়া—মহাভারতে বর্ণিত সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী। এ কাহিনীতে প্রেম বিচ্ছেদকে মৃত্যুকে স্বীকার করেনি, মৃত্যুই প্রেমকে বিজয়ী বলে পরাজয় স্বীকার করেছে। যোগপন্থায় অধ্যাত্মসিদ্ধির **Symbol** বা প্রতীক হিসাবে এ কাহিনীর মূল্য সবার উপরে।

কাহিনীটি নেওয়া মহাভারত থেকে, একে রূপ দেওয়া হয়েছে রামায়ণের মত মহৎ মহাকাব্যের। এর উপজীব্য মানুষের আত্মিক জীবন—যে জীবন বিশ্ব-চেতনার পর পর স্তর ভেদ করে উর্ধ্বে অভিযাত্রী। কবির দৃষ্টি বাহ্য চেতনা, অবচেতনা, বুদ্ধিচেতনা, বোধি-চেতনা ইত্যাদি পেরিয়ে আলোকপাত করতে করতে চলেছে অনির্বচনীয়ের অভিসারে, যেমন

চলেছিল বাল্যের রূপকথার রাজপুত্র হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, রূপার পাহাড়, সোনার পাহাড় ইত্যাদি পেরিয়ে বন্দিনী রাজকন্যার সন্ধানে। সাবিত্রী মহাকাব্যে শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্য-কবিতার বিষয়ে তাঁর যে আদর্শ তাকে রূপ দিয়েছেন। ভবিষ্য-কবিতার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে সাবিত্রী সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে।—ভবিষ্য-কবিতা কেবল মানুষকে এবং পার্থিব জড় প্রকৃতিকেই উদ্ঘাটন এবং বিশ্লেষণ করবে না। তা আমাদের আত্মিক জগতের অন্যান্য প্রত্যন্তেও বিচরণ করবে। প্রাকৃত লোকের ঊর্ধ্বে যে অতিপ্রাকৃতলোক সে জগতেও আমাদের প্রবেশ-অধিকার দেবে। আমরা অতিপ্রাকৃত পরিবেশে অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডলে অতিপ্রাকৃত সত্ত্ব ও সত্তার সংস্পর্শে আসব এবং সে অতিপ্রাকৃত আমাদের পাশেই রয়েছে কালো বা শাদা পর্দায় ঢাকা। এই অতিপ্রাকৃতও শেষ গন্তব্যস্থান নয়, তার পরেও আছে অধ্যাত্মলোক। সেখানেও আমাদের প্রবেশ নিরুদ্ধ হবে না।—এর উপরেও শ্রীঅরবিন্দ অনেক কথা বলেছেন আমি তা বলতে অপারক, কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায় সাফাই দিই—"ইহার পরে বুদ্ধির গতি নাহি আর।"

সাধারণ সাহিত্যের মধ্যে আমরা খুঁজি আমাদের পরিচিত জীবনের ছবি, সে জীবনে আমরা অভ্যস্ত, যার বাইরে আমাদের মনবুদ্ধির গতি নেই, সেই গণ্ডীবাঁধা জীবনের মধ্যে একটুকু নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর। সংসারে যে তৃপ্তি আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান, যা ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হাতের কাছে এসে পালিয়ে যায় সেই ঈপ্সা ও অভীপ্সার রঙীন কানুন দেখতে চাই আমরা কাব্যে উপন্যাসে গল্পে ও অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টিতে। এর উপরের কথা যে সাধারণ সাহিত্যে একেবারেই মেলে না তা নয়। মহাজীবনের, অধ্যাত্মজীবনের দিকে ইসারা বড় কবির বড় লেখকের রচনায় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে ইসারা সাধারণ পাঠকের নজর এড়িয়ে যায়, সুতরাং সে ইসারা তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যচিন্তা (অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচনা) পরিচিত জীবনের বাইরেই বিস্তারিত। পরিচিত জীবনকে তিনি অস্বীকার করেছেন মনে করলে ভুল করব, পরিচিত জীবনকে তিনি যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাকে tentative বলতে পারি, যেমন tentative মানুষের দেহ ও জীবন। সাধারণ সাহিত্যে অধ্যাত্মলোক সুদূর পটভূমিকা আর ইহলোক রঙ্গভূমি। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যে এর ঠিক বিপরীত—ইহলোক যেন পটভূমিকা আর অতীন্দ্রিয়লোক অধ্যাত্মজীবনের রঙ্গভূমি। শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মত অনুসরণ করলে এ কথা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা জীবসত্তার বিশ্লেষণে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই পাঁচটি উত্তরোত্তর স্তরের কথা বলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সাইকো-স্পিরিচুয়াল এনালিসিস করে এই ধরনের স্তরভেদ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, অসভ্য বর্বর মানুষ পুরাপুরি অন্নময়কোষের জীব।

দেহাত্মবাদী অর্ধসভ্য মানুষ অন্নময় ও প্রাণময় দুই কোষ সঞ্চারী জীব। সভ্য মানুষ অন্নময়, প্রাণময় আর মনোময় কোষের জীব। মনোময় কোষের অতীত হয়ে মানুষ যখন সুপ্রা-মেন্টাল বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে গিয়ে স্বরূপে পৌঁছবে তখনই মানব-সভ্যতার উচ্চতর পরিণতি দেখা দেবে। এর জন্যে সাধনার প্রয়োজন, যোগের প্রয়োজন। এ যোগ সংসারকে ত্যাগ করে নয়, সংসারে আসক্তি বর্জন করে কর্মকুশলী হওয়া (যাকে গীতায় বলেছে, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্) এবং সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের শক্তি অর্জন করা। তার জন্যে চাই নিষ্ঠা, চাই অভিনিবেশ, চাই ধ্যান, চাই আত্মসমর্পণ।

তাহলে দেখছি যে অতীন্দ্রিয় লোকের অভিসার শ্রীঅরবিন্দের জীবনসাধনায় যেমন, তাঁর সাহিত্য সাধনায়ও তেমনি অভীপ্সিত। এ অভীপ্সা তো সকলকার জাগে না। যার জাগে, সে কোটিকে গোটিক। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যে সকলের প্রবেশাধিকার নেই, বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রবেশও অবারিত নয়। অধ্যাত্মলোকের অতীন্দ্রিয় জগতের কথা এ জগতের ভাষায় সংকেত (Symbol) ছাড়া বলা যায় না। সেই জন্যে আমাদের দেশের সাধকেরা বেদ-উপনিষদের আমল থেকে রূপকের ছাঁদে প্রহেলিকার আড়ালে অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব প্রকাশ করে এসেছেন। ঋগ্বেদের নিষ্টিক কবি বলেছেন,

ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদ অস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ॥

অর্থাৎ 'এ কথার মানে কে জানে বলুক দেখি : সেই শোভন সুপর্ণের পদ কোথায় নিহিত। তার গোরু সব মাথা থেকে দুধ দেয়, আর তারা পোষাক পরে পায়ে হেঁটে জলকে যায়।'

অথবা, যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে,

পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ 'ও-ও পূর্ণ, এ-ও পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণতা স্বতন্ত্র হন। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'

পরবর্তীকালের কবি-সাধকেরাও এমনি হেঁয়ালির ধরনে অধ্যাত্ম পথের হদিশ দিয়ে গেছেন। সেদিনের বাউল গানে তার যে পরিণতি তা আমাদের অপরিচিত নয়।

শ্রীঅরবিন্দ এ হেঁয়ালির রীতি অবলম্বন করেন নি। কারণ এ হেঁয়ালির ছাঁদ সাহিত্যের পরিচিত সরণি নয়। এতে আগে থেকে অধিকার থাকা চাই। হেঁয়ালির যেসব code-words তার মানে জানা না থাকলে বিশুদ্ধ নিষ্টিক কবিতার আবেদন সাধারণ অর্থাৎ অসাধক কবির কাছে একেবারে ব্যর্থ। তাই শ্রীঅরবিন্দ হেঁয়ালির ছাঁদ বর্জন করে সাহিত্যের আধুনিক রীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কোড-ওয়ার্ড ব্যবহার না করে

সাধারণ অভিধাকে সিম্বলিক সঙ্কেতের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ভাষার সিম্বলিক ব্যবহার শব্দের মানের উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করছে ভাবের উপর। এই জন্যে শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য টেক্‌নিক্যাল মিষ্টিক সাহিত্য হয় নি, হয়েছে সাধারণ সাহিত্য। তবে আগেই বলেছি—এ সাহিত্য সকলের জন্যে নয়। পাঠকের মানস-প্রস্তুতি এতেও আবশ্যক। যার সে প্রস্তুতি নেই তার কাছে অরবিন্দ-সাহিত্যের আবেদন ব্যর্থ। একেবারে যে ব্যর্থ সে কথা বলতে চাই না। খানিকটা সার্থকতা সকল রকমের পাঠকের জন্যেই আছে। কিন্তু সেই সাধারণ আবেদনটুকুর মধ্যে এ সাহিত্যের মহত্ত্ব সবটা ধরা পড়বে না।

একদা রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে দেশবন্ধু বলে স্বাগত করেছিলেন, আর বলেছিলেন "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি"। মহাকবির সে কথা ব্যর্থ হয় নাই। যখন কবিতাটি লেখা হয় তখন স্বদেশীর যুগ—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা। তখন অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন দেশবন্ধু—তারপর শ্রীঅরবিন্দ হয়েছেন বিশ্ববন্ধু। তিনি স্বদেশ-আত্মার শুধু নয় বিশ্ব-আত্মার সেই বাণীর বাহক যে বাণী কানে শোনা যায় না—যা আমাদের প্রাচীন ঋষিদের ভাষায় 'পরা বাণী'। সে বাণী শোনবার জন্যে কান তৈরী করতে হয় সাধনার দ্বারা যোগের দ্বারা।

সাহিত্যপ্রবণতা শ্রীঅরবিন্দের জন্মসূত্রে পাওয়া, অধ্যাত্মভাবনাও তাই। তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতাব্দীর ঋষি ছিলেন। সংসারে থেকেও তিনি ছিলেন যোগীর মত নির্লিপ্ত। সাহিত্যসাধনায় তাঁর ছিল অনায়াসগতি। অথচ তিনি তথাকথিত সাহিত্যিক ছিলেন না। ছিলেন সাহিত্যগুরু। বালো রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পেয়েছিলেন ইংরেজীসাহিত্যপ্রীতি। এটা তাঁর জীবনে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল। সে কথা তিনি ভাল করে বলেছেন। রাজনারায়ণের কোন কোন পুত্রেরও ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। তাঁর এক পুত্র মনীন্দ্রনাথ কয়েকখানি ভালো ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাইদের সাহিত্যকৃতিত্ব আপনাদের অজানা নয়। অতএব বলা বাহুল্য সে কথা। শ্রীঅরবিন্দ জীবনকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই তাঁর কাব্যসৃষ্টি, সমালোচনা ও অধ্যাত্মভাবনার মধ্যে পৃথকত্বের দাঁড়ি টানা যায় না। এই কারণে তাঁর রচনার ও সমালোচনার স্বরূপবিচার ও মূল্য নির্ধারণ সাধারণ জ্ঞানে সহজসাধ্য নয়। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আমাদের প্রাচীন ঋষিদের দৃষ্টির মত সর্বদা নামরূপকে ছাড়িয়ে সত্যবস্তুর নিত্যসত্তার দিকে ধাবমান। ভারতীয় চিত্রকলার ও স্থাপত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একদা তিনি যে কথা লিখেছিলেন সে কথা উদ্ধৃত করি। "অতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানসিক ভাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধান গুণ, উহার উৎকর্ষ।

পাশ্চাত্য বাহিরের অনুভব লইয়াই ব্যস্ত, তাহারা ছায়ার ভক্ত, প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করেন, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্য নামরূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, তেমনিই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।"

তাই বলে যদি আমরা শ্রীঅরবিন্দের ভাবনা ও কৃতিকে একান্তভাবে প্রাচ্য বলে ছাপ দিই—তবে অত্যন্ত ভুল করব। তাঁর চিন্তায় কর্মে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অবিচ্ছিন্ন যোগ হয়েছে। তা না হলে তাঁর চিন্তা কর্ম এযুগের গ্রাহ্য হত না। একদা তিনি লিখেছিলেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব।"

পূর্বপশ্চিমের এই সিন্থেসিস্ শ্রীঅরবিন্দের কর্মচিন্তার মধ্য দিয়ে মানুষ-সমাজের এক বৃহত্তর পূর্ণতর জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এ এক পরম সার্থকতা।

মানুষের বিবর্ত্তন-ইতিহাসে এক অধ্যায়

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের আবির্ভাব ঐতিহাসিকদের কাছে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। অতীতের সব ঘটনা থেকে তা এতই পৃথক। একদিকে তারা, অন্যদিকে তাদের পূর্ব্বপুরুষরা—উভয়ের মধ্যে মনে হয় যেন কোনো নিশ্চিত সংযোগ নেই। গ্রীক সভ্যতার জন্মদাত্রী মিনোয়ানী (Minoan) বা ক্রিটানী (Cretan) সভ্যতা, কিন্তু প্রাচীনতর প্রবীণতর সভ্যতার যে-সব চিহ্ন পাই তার সঙ্গে এদের আছে কোনো সম্বন্ধিতা কোনো সম্বন্ধ? বস্তুত প্রশ্নটির এই হল আসল রূপ। গ্রীক সভ্যতার আগে যা তা-ই প্রাচীন, তা হল আদি বা আদিম যুগের, পুরাতন যুগের। মিশর পুরাতন, ফিনিশিয়া পুরাতন, হিব্রু পুরাতন—তারা কেবলমাত্র অনাধুনিক নয়। আয়োনিয়ার আকাশে-বাতাসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আসত যেন ওলোনের গন্ধ—তা মনে হয় যুগযুগান্ত পাড়ি দিয়ে আজো আমাদের নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করে। অলিম্পাস ও ইডার কোলে জন্ম নিয়েছে যে অমর মানুষ তাকে আজো পথ দেখায় হোমার, সোলোন, আরিষ্টোটল, পিথাগোরাস ও প্লেটো।

হেলেনিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিবর্ত্তন-ইতিহাসের ধারাও একটা সম্পূর্ণ অন্য পথে ঘুরে দাঁড়াল। আর বিবর্ত্তনের প্রত্যেকটি সন্ধিক্ষণ হল একটা হঠাৎ উল্লাস বা আকস্মিক প্রকাশ, একটা অপ্রত্যাশিত স্ফুরণ—যন্ত্রণার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া। গ্রীকরা এনেছিল মন, প্রদীপ্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ বিচারবুদ্ধি, অথচ তারই মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল চেতনার একটা অলৌকিক আলো। এই তার মনের সম্পদ একদিকে পেয়েছে একটা বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে যে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান—সংবেদ ও সম্বোধি যাকে বলি তাকে, অন্যদিকে তা আবার গিয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং জড়বস্তুর প্রভুত্বশক্তি দূরে নিলেনিশে এনে দেয় যে জ্ঞান তার মধ্যে।

মিশর, ইজরায়েল অথবা কালদিয়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক—এখানে মানুষের সম্বোধি অনেকখানি সংবেদ বা প্রাণের সঙ্গে মিশে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, খরগতি, কল্পনাপসারী, পুরাণোপজীবী, সূক্ষ্মদ্রষ্টা এবং সূক্ষ্মশ্রোতা (গ্রীকরা কিম্বা নব্যপন্থীরা এই 'সূক্ষ্ম'-কে 'স্পষ্ট' বলে মনে নাও করতে পারেন), তা অন্য এক লোকের জিনিস সব নিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে, এই পৃথিবীকেই যথাসম্ভব টেনে তুলে ধরেছে অন্যলোকে, উভয়ের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে যোগাযোগের আলাপের প্রত্যক্ষ সূত্র।

গ্রীকরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের। তারা যুক্তিবুদ্ধির জাত—একান্তভাবে ঝোঁকের বশে অথবা প্রধানত প্রাণজ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চলে বা কাজ করে না তারা, কারণ তাদের কাছে এসব জিনিসও আসে একটা যুক্তিসিদ্ধ ন্যায়সঙ্গত ছকের মধ্যে দিয়ে পরিগ্রস্ত হয়ে : মন দিয়েই তারা জড়কে জানতে এবং জয় করতে চায়। আধুনিক পদ্ধতিই এই—নিরীক্ষণ এবং পর্যাবেক্ষণ, তারই আর এক নাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অবশ্য গ্রীকদেরও ছিল দেবদেবী, ছিল পুরাণকাহিনী, তবে কিছু পৃথক ধরণের। দেবদেবীরা এখানে চিত্রিত হলেন মানুষীরূপে, নিতান্তই মানুষীরূপে—কতকটা অনুযোগ করে যেমন বলা হয়। আইসিস, অসিরিস, মোলক, বাল, এমন কি য়িহুদি যেহোবার চেয়ে সহস্রাংশে বেশি মানুষী জিউস এবং জুনো (হেরা)। এই প্রাণজ দেবতাদের ঘিরে থাকে একটা গাম্ভীর্য—তারা কঠোর ও কঠিন, দৃঢ় ও শক্তিবান, তাঁদের নেই আপোলো (আপোলো আবার 'সুদর্শন' **Belvedere**) বা হারমেস-সুলভ আলো হাসি মাধুর্য্য। গ্রীকরা বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই বলা চলে—তাদের ভাস্কর ফিডিয়াসের দৃষ্টান্ত ধরে এই দেবতাদের ঘষে মেজে দিয়েছে একটা অন্যতর রূপ, অন্য উদ্ভাসতর এক আকৃতি, তাদের নিয়ে এসেছে মানুষ ও মর্ত্যের আরো আছে।* বলা হয় না কি যে সক্রেটিস স্বর্গ থেকে দেবতাদের পৃথিবীর উপর নামিয়ে এনেছিলেন ?

গ্রীকেরা যে এনেছিল এই সংযোজনী বৃত্তি—**paraclete**, মানুষের উন্নতির সৌধে তা হল ভিত্তিপ্রস্তর। এ বৃত্তি মনের সৃজনপ্রতিভা—তা বস্তুর বস্তু হিসাবে দেয় একটা আকার-আয়তন, একটা স্থায়িত্ব ও সুগ্রাহ্যতা। তবে মানুষের মধ্যে আছে আরো গভীরতর উর্দ্ধতর উৎসাবলি, আরো ঋজু আরো প্রত্যক্ষ তারা, সেখান থেকে জন্ম সব জিনিসের। কিন্তু সূক্ষ্মতর গভীরতর সত্যদের পার্থিব আধারে প্রমূর্ত্ত করে তুলতে হলে, সাধারণ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিস্ফুট করে ধরতে হলে এই মনোবৃত্তির প্রয়োজন আছে।

সক্রেটিসের বিখ্যাত কথোপকথন যে আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভে স্থাপিত করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত ; আধুনিক মনের প্রকৃতি দেখিয়ে দেয় তা। যে যুক্তিবাদী মন, যে বুদ্ধি-চাতুর্য্য ও অবধারণশক্তিকে আরিষ্টোটল তাঁর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সংযত করে দেখিয়েছিলেন তা-ই আলোরূপে রোম-সাম্রাজ্যের যুগে গ্রীক-লাতিন সভ্যতার মধ্যে দিয়ে বিকীর্ণ হয়েছিল —মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তঃসার হয়ে ছিল তা। পরবর্ত্তী যুগের সামাজিক

---

* কৃষ্ণোনিয়ান দেবতাদের ঠিক বিপরীত অলিম্পীয় দেবতারা। অলিম্পীয় দেবতাদের রং হয় সাদা, কৃষ্ণোনিয়ানরা কালো অথবা রক্তবর্ণ; অলিম্পীয় মন্দির পূর্বমুখী, কৃষ্ণোনিয়ান মন্দির পশ্চিমমুখী। এরকম আরো কতকগুলি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে।

কি সাংস্কৃতিক কোনো পরিবর্তন বা বিপ্লব তাকে স্পর্শ কিছু করেনি, তারা বরং দাঁড়িয়েছে এ জিনিসটিকে ভর করে, এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। এমন কি, আমাদের আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর সংস্কৃতিও এই ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।

যুক্তিসার মন হল একটা ইস্পাতের কাঠামো যাতে জড়জীবনে কাজে লাগে, অভিজ্ঞতার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, চেতনার অন্য সব স্রোতোধারা—বিশুদ্ধ ভাব, কল্পনা, প্রাণজ ও ইন্দ্রিয়জ ভাব, এমন কি গভীরতর সত্য এবং বৃহত্তর বাস্তবতা পর্যন্ত। প্রাচীনতর যুগে মানুষী চেতনায় সত্যসত্তাই একটা ফাঁক ছিল। ইতিহাস-বর্ণিত প্রাচীনতম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতীয় বৈদিক যুগের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। এখানে মানুষের চেতনা তার শীর্ষে পৌঁছেছে—তার গভীরতা এবং উচ্চতা বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু সেই চেতনার ঊর্দ্ধ জগৎ, সেই প্রায় গুহাবিদ্যার গহন লোক, আর এই জড় ইন্দ্রিয়ের জগৎ—দুয়ের মধ্যে একটা ফাঁক। তবে বোধ হয় সেই ফাঁকের জন্যই সেই জগৎ গুহ্যবিদ্যার জগৎ হতে পেরেছিল। স্থূল-জীবন এবং মন অলৌকিককে প্রকাশ করতে পারত শুধু প্রতীক ও প্রতিমা অবলম্বনে; সে প্রকাশ ছিল না সরাসরি স্পষ্ট, ছিল চিত্রলেখার মাধ্যমে। যাগযজ্ঞ পূজা উপাসনা ছিল জীবনে, মনে পুরাণ আর রূপকথা।

এই ধরণের চেতনার পক্ষে উপকথা বা পুরাণই ছিল অনিবার্য্য। তখনকার যৌগিক ভাষাতেও ছিল অলঙ্কার ও রূপকের প্রাধান্য—তারা ভাব বা বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম নিরালম্ব তাত্ত্বিক বর্ণনা মাত্র দিত না, তাদের মূর্ত্ত অবয়বী করে তুলত। বুদ্ধির যুগ পরে নিয়ে এল দর্শনের যুগ, তত্ত্ববিচারের যুগ, বিশ্লেষণী ভাষার যুগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রীক ভাষারই প্রথম শুরু হয় উপসর্গের (সকল বিশ্লেষণাত্মক ভাষার তা হল মেরুদণ্ড) স্বাধীন ও আত্মনির্ভর স্থান। গ্রীকের সঙ্গে সঙ্গে এল বৈজ্ঞানিক চেতনা।

ভারতে দেখি আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বলেছি বেদ হল রূপক-কাহিনীর যুগ—সে-যুগে জ্ঞান-অর্জন ও জীবন-গঠন হত শ্রুতির সাহায্যে। তারপরে উপনিষদের যুগ—বলতে পারি, এখানে অবতরণের আলো মনের উচ্চস্তরগুলি স্পর্শ করেছে—শুদ্ধ, নৌল, আদি ভাবসমূহের আধার সে-মন। সাক্ষাৎজ্ঞান ও সম্বোধির আলোয় থেকেও চেতনা এবার তার পৌরাণিক ও রূপকের বেশভূষা অনেকখানিই বিসর্জন দিয়েছে—তার উপর পড়েছে দিনের আলো, সাধারণ ও স্বাভাবিক সহজ অবস্থার প্রখর সূর্য্যালোক।

প্রকৃত যুক্তিবাদী মনের আবির্ভাব বা প্রথম স্ফুরণ ঔপনিষদ যুগের শেষ দিকে—মহা-ভারত আর ব্রাহ্মণগুলি দিয়ে। তার মধ্যাহ্ন নানা মতবাদের দার্শনিকদের মধ্যে—বোধ হয় সাংখ্য তাদের প্রধান, আর তারপর বৌদ্ধরা। লক্ষ্য করবার মতো, বুদ্ধ হলেন সক্রেটিসের প্রায় সমকালীন এবং চীনা দার্শনিক ও সদাচারী কনফুসিয়াসের একেবারে সমসাময়িক—

বুদ্ধির শিখরদেশে এই ত্রিমূর্তি প্রায় এক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছেন মানুষের সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলে। বুদ্ধ নামই অর্থবহ। তার অর্থ 'আলোকিত'—জাগ্রত মনীষা, বিচার ও বুদ্ধির আলোয় আলোকিত। বৌদ্ধরা বলে বুদ্ধের যুগ—যতদিন বুদ্ধের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ প্রবল—প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ব্যাপী; তার তিরোধানের পর থেকে গুণলে তা এসে যায় ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে।

বেদ বলছে ইন্দ্র হল দেবরাজ। গ্রীক দেবমণ্ডলীতে জিউসেরও অনুরূপ স্থান। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যে দেবতারা তাঁরা 'সুরূপকৃতনু'—এই নানা রূপ দিয়ে তাঁরা গোপন করে রেখে জীবনে সার্থক করবার বিচিত্র সিদ্ধির সম্ভার; এঁদেরও নেতা ইন্দ্র। ভারতে পরবর্তী কালের এবং আমাদের অধিকতর পরিচিত ইন্দ্র আর গ্রীসের জিউস উভয়েই প্রাচীন ইন্দ্রের আর এক ধাপ নিম্নের রূপ—সেখানে চেতনা আরো বুদ্ধিগত, মানসচারী, যুক্তিপ্রিয়, ইন্দ্রিয়বদ্ধ, স্থূল ও ব্যবহারিক হয়ে উঠেছে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে এথেনীয় রোমক নাম মিনার্ভা এসেছে, পণ্ডিতেরা বলছেন, ল্যাটিন কথা 'মেন্স' থেকে—যার ও-শব্দটির অর্থ যে মন তা আমরা সকলেই জানি।

আমি বলেছি গ্রীক মন যেন সংযোগের সেতু—তার একদিকে ইন্দ্রিয়নুখিতা, দেহ-পরতা, ঐহিকতা, আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা, সূক্ষ্মবিদ্যা ও সমাধি। গ্রীকরা এসে যেন এক পাকা রাস্তা তৈরী করে মানুষী অভিজ্ঞতার এই দুই স্তরকে মিলিয়ে ধরল, এখন এ-রাজ্য থেকে ও-রাজ্যে অনায়াসে যাতায়াত করা চলে। ভগবান, দেববৃন্দ ও দেববিধানের এখন আর রূপক ও উপরাচ্ছলে পরোক্ষে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই; এখন আমরা স্পষ্ট খোলাখুলি বুদ্ধির ভাষায় সাধারণগ্রাহ্য করে সে-সব বলতে পারি, বুদ্ধি ও যুক্তির অতীত ও ওপারে যা তার অনেকখানিই বিচারবুদ্ধির আয়ত্তনের মধ্যে ফেলে ধরতে পারি।

ভারতেও এই যুগান্তরের এক ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল—কিম্বা, এখানে যেন বিলম্বিত চালে এসেছে প্রয়োজনীয় এই যুগান্তরের রূপটি। মনে হয় এখানে বিবর্তনের ক্রমানুয়ধারা হয়েছে আরো স্পষ্ট, তার পদচিহ্নশ্রেণী ঘনপরম্পরায় বিন্যস্ত। মানুষী চেতনা এখানে গভীর যুগান্তকারী সব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও তার ধারাবাহিক গতি রেখেছে অটুট।

মিশর, কালদিয়া, সুমেরিয়া এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সমানে চলে এসেছে ভারতবর্ষ—তাদের ভাবভঙ্গির সঙ্গেও তাল রেখে। আবার তাই বলে পরিবর্তন-পরাঙ্মুখ হয়ে নেই সে—সে গড়ে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে আরো, নূতন নূতন পথের মহিমা নিয়ে। মিসাটিকদের সঙ্গে মিসাটিক ভাষায় কথা বলেছে সে, আবার বুদ্ধির ভাষায় বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে। আজ দেখছি বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞানের ভাষায়ও কথা বলছে সে।

তাই ত ভারতবর্ষ আজো জীবন্ত, অথচ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ও অ্যাটলান্টিসের পথ ধরে

সেই পুরাণো বিশ্বর ও কালদিয়া কোথায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেল। ভারতের অন্তরে কোথায় শাশ্বতের বীজ, জীবন্ত সক্রিয় স্ফুলিঙ্গ—সে-বস্তু প্রকাশ হবার পুনর্জন্ম হবার জন্য ব্যাকুল; ভবিষ্যতের কোন এক পরম সত্য বিশ্বমানবকে দান করবার জন্য অন্তরে সে পোষণ করছে—তা এক নবপ্রকৃতির নূতন বিশ্বমানব।*

---

* লেখকের মূল ইংরাজী থেকে অনূদিত।

বৌদ্ধ অবদান

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বৌদ্ধধর্মকে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান। বিশেষণটি আমরা সদর্থেই গ্রহণ করব, কটূবাক্য হিসাবে নয়। কারণ বিদ্রোহী যে কেবল ধ্বংসধর্মী হিংস্র জীব তা নয়; আর পুরাতনকে ভেঙে ফেলাই যে তার একমাত্র সার্থকতা তাও নয়। বিদ্রোহ নূতনের বীজ বপন করে, এবং তাকে যে রুদ্রভাব ধারণ করতে হয় তা চলিত বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে। বর্তমান ক্ষেত্রে বিদ্রোহ-ব্যাপারটি আমরা আরো একটু অন্য দিক দিয়ে দেখতে পারি। এগিয়ে যাবার পথে মানুষ যদি কোন সত্যকে ফেলে যায়, তার যথাযথ পরিপূর্ণ হিসাব না রাখে, মর্যাদা না দেয় কিংবা ভুলে যায় ডিঙিয়ে যায়, তখন মানুষকে ফিরে এসে সেটা তুলে নিতে হয়, স্বীকার করে প্রতিষ্ঠা করে সঙ্গে নিয়ে আবার চলতে হয়।

বুদ্ধ এসে দুটি উপেক্ষিত বা বিস্মৃত সত্যকে উদ্ধার করেছিলেন, মানবজাতির জাগ্রত চেতনার সম্মুখে ধরে দিয়েছিলেন—অস্পৃশ্য উদ্ধারের ব্রত যেন! প্রথম হল মানুষের বুদ্ধিশক্তি, অর্থাৎ যে বুদ্ধি বিচার-বিতর্ক-প্রতিষ্ঠ, যা হল মস্তিষ্কের বল ও বৃত্তি। দ্বিতীয়, তিনি মানুষকে মানুষভাবে দেখেছিলেন, দেবতার মতন কল্পনা করে নয়—মানুষী দুঃখতাপ দূর করাই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। গ্রীক জ্ঞানী সক্রেটিস সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি দর্শন-বিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞানকে স্বর্গ হতে নামিয়ে পৃথিবীর উপরে মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। গ্রীসে সক্রেটিস, চীন দেশে কন্‌ফুসিয়াস্ আর ভারতবর্ষে বুদ্ধ, এঁরা তিনজনে প্রায় সমসাময়িক ছিলেন, এবং তিনজনেরই কাজ ঐ এক ধরণের ছিল, যদিও বিভিন্ন ভঙ্গীতে।

প্রাচীনতর কালে মানুষের চেতনা মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার-বিতর্কের উপর নয়—তার প্রতিষ্ঠা ছিল সাক্ষাৎ-অনুভব, অনুপ্রেরণা, আন্তর বোধ বা দৃষ্টি। তার কারবার মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে নয়—মানুষ, জীব, প্রকৃতি তখন ছিল দেবাভিমানী সত্তা—অর্থাৎ এ সবই ছিল একটা সূক্ষ্মতর অতীন্দ্রিয় লোকের প্রতীক বা বাহন। এ জগতের সঙ্গে, ঐহিকের সঙ্গে, আধিভৌতিকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল ততখানি ও সেই হিসাবে, যতখানি ও যে হিসাবে সে-সব আধি-দৈবতের অনুগত। পৃথিবীর সুখ বা দুঃখ তার কানে পৌঁছিত না, তার শ্রুতি খোলা ছিল আর এক উদগীথের দিকে। সৃষ্টিকে দেখা হত অন্তঃহৃদয়ের সোনালী রঙের ভিতর দিয়ে—তাই তারা অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছে,

এ সকলের জন্ম আনন্দ থেকে, এরা সব আনন্দ থেকে আনন্দের ভিতর দিয়ে চলেছে আনন্দেরই দিকে। এই যে মধুময়ী শ্রীময়ী দৃষ্টি তা হয়ত মানুষের নবীন বয়সের, তারুণ্যের বৃত্তি। পরিণত চেতনার, বিচার-বিতর্কের খরতর রূঢ়তর বৃত্তি পরে আসতে বাধ্য। অনুভব প্রত্যয় যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অপরোক্ষ, ঐক্যে ও সামগ্র্যে সুষম, তন্ময় আনন্দে প্রোজ্জ্বল—তা এখন দুঃখত্রয়াভিঘাতের ফল জিজ্ঞাসা-বিশ্লেষণ-পরায়ণ বাদ-প্রতিবাদ। স্থূল চোখে দেখি যে দৃশ্য, অজ্ঞানের যবনিকা, তৃষ্ণার বিকার, রোগ-শোক-বেদনার জ্বালা, নশ্বরতার রাজ্য, তাকে মানতে হবে স্বীকার করতে হবে—নতুবা তাই হবে মায়া মোহ ; তারপর জেনে বুঝে পরখ করে প্রমাণ করতে হবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এদের মূল্যহীনতা, এদের যথার্থ রূপ এবং পার হয়ে যেতে হবে ওপারে। একই ব্যাধার ব্যথী সকলে, তাই মানুষে মানুষে সম্মেলন —অন্তঃপুরুষে আনন্দের ঐক্য সহজগ্রাহ্য সত্য নয়। এই অনুভব বৌদ্ধ কারুণ্যের পিছনে। অনুরূপ সম্ভোগ প্রত্যয় দিয়ে সৃষ্টিকে দেখি আত্মার চেয়ে অনাত্মেরই বিভাব রূপে—নিত্য-চঞ্চলতার, ক্ষণিকা ও ক্ষণিকা শ্রেণীর প্রবাহ হিসাবে। মানুষের জাগ্রত বুদ্ধি জগতের দেয় এই পরিচয়।

তবে আধুনিক বুদ্ধিবাদ নিয়ে চলে যে নাস্তিকতা ও নৈরাশ্যের দিকে বৌদ্ধ নাস্তিকতা ও নির্ব্বাণ বা শূন্য সে ধরণের বস্তু নয়। আজকালকার বৈজ্ঞানিক জগৎকে দেখছে বল-বিন্দুর সমষ্টি হিসাবে—এই সব বিন্দুধারা আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে চলেছে অনিবার্য্য ক্ষয়ের দিকে, লয়ের দিকে। প্রকৃতির গতিকে বিপরীতমুখী করা যায় না। এই যে ধ্বংসোন্মুখ সৃষ্টিপ্রবাহ, বুদ্ধিজীবী মানুষ যার পরিচয় পেয়েছে, কি ভাবে তাকে নিয়ে সে কারবার করবে ? হতাশ হয়ে তাতে গা ছেড়ে ভেসে যাওয়া একটা উপায় হলেও, তা মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। তাই সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠেরা বলছেন শাস্তসংযত সবল হয়ে জিনিষটা সহ্য করে চলা। নিয়তিকে কেউ ব্যাহত ব্যর্থ করতে পারে না—কিন্তু বীরের মত সম্মুখীন হতে পারে, নিজেই তার সহযোগী হয়ে চলে যেতে পারে। সক্রেটিস এই ধারায় চলেছিলেন, কন্‌ফিউসিয়সও নোটের উপর এইভাবে অনুপ্রাণিত।

বুদ্ধের বিশেষত্ব "এহ বাহ্য" বলে, তিনি আরো একটু এগিয়ে গিয়েছেন, অন্যতর ভাবে ও চেতনায়। সৃষ্টিকে তিনি দেখলেন জড়ধর্ম্মী বলবিন্দু হিসাবে নয়, কিন্তু চৈতন্য-বিন্দু ("ক্ষণিক-বিজ্ঞান") হিসাবে এবং এই চৈতন্যের স্বরূপ তৃষ্ণা বলে নির্দ্দেশ করলেন। জাগ-তিক দুঃখের নিদান তবে এই তৃষ্ণা—এবং এই তৃষ্ণার লোপেই পরমাপ্রশান্তি ও পরিনির্ব্বাণ। বৌদ্ধ-সাধনা তাই হল তপস্যার সাধনা—মানবজাতিকে তিনি দিয়েছিলেন ঊর্দ্ধমুখী তপস্যার ব্রত। এই তপস্যা অর্থ ক্লেশ তিনি বোঝাতে চান নি—মানসিক বলের উপর ভর করে, একটা প্রশান্ত বৈরাগ্য ও একাগ্রতার ভিতর দিয়ে চেতনার ঊর্দ্ধায়ণ, এই তাঁর সাধনার মূল তত্ত্ব।

উপনিষদে বা প্রাচীনতর সাধনায় ঊর্দ্ধ হতে অবতরণ, আত্মার স্বেচ্ছা-বরণ দেব-প্রসাদের কথা আছে। আমি বলেছি সে-জিনিষ হল মানুষী অন্তরাত্মার অধ্যাত্মের প্রথম স্পর্শ, মানবীয় চেতনায় উষাকালের অনুভূতি এ। কিন্তু এ বস্তু স্থায়ী হতে পারে না, মানুষের জীবনে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না, যদি না তা প্রতিষ্ঠা পায় একটা সজাগ বুদ্ধিবৃত্তির উপর, বিচারের উপর। এই ধরণের সমর্থ মন মানুষের কাছে আজ সহজ ও সাধারণ হয়েছে, তার মূলে রয়েছে এই বৌদ্ধ অবদান।

মানসশক্তির পরিবর্ত্তে মনের মধ্যে মানসোত্তর বৃত্তি ফিরে আবার স্থাপন করবার যুগ এসেছে। যেমন মানবীয় ভাব ও ধারার পরিবর্ত্তে আজকাল বলা হয় একটা অতি-মানবীয় প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তন প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবী। বৌদ্ধেরাও বলেন একটা বৌদ্ধযুগ শেষ হল গৌতম বুদ্ধের ২৫০০ বৎসর—এর পরে আর এক বুদ্ধ, মৈত্রেয় বুদ্ধের যুগ আরম্ভ। আমরা আশা করি এবার সত্য সত্যই বিশ্বমানবে মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সে মৈত্রীর উৎস মানসোত্তর চেতনার অটল অব্যভিচারী ঐক্য—মানস রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যার আবার সুষম-প্রকাশ বৈচিত্র্য। মানবজাতির তপস্যার, সাধনার, ঊর্দ্ধায়ণের পর্য্যায় অতিক্রান্ত হল, এবার এল কি সিদ্ধির সার্থকতার পরিপূর্ণতার অবকাশ?

আশ্রম-বালকবালিকাদের প্রতি

শ্রীমা

আমাদের এখানকার শারীর-শিক্ষা সম্বন্ধে আজ কিছু বলব—বিশেষতঃ আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে রয়েছে যে ভাবটি সেই সম্বন্ধে। এ কথা শ্রীঅরবিন্দ লিখে গিয়েছেন, আমিও লিখেছি, বলেছি অনেক তোমাদের—কিন্তু দুঃখের কথা, তোমাদের চেতনার মধ্যে তা যথেষ্ট প্রবেশ করেনি।

তোমাদের ধারণা কি তোমাদের আচরণ কি তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে নেমে যেতে চাই নে, আমি চাই তোমরা একটু বুঝতে চেষ্টা কর এখানে যা করা হয় তা ও-রকমে কেন করা হয়, গতানুগতিক সরাসরি পথা ফেলে না দিয়ে, এই অদ্ভুতাতে যে তোমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ আদিপুরুষ পর্যন্ত সকলে তা করে এসেছে, এবং বাইরে যারা আছে তারা আজও এই রকমই করছে আর তাই হল সহজ স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত ধারা।

আমি অস্বীকার করি না এ সত্যকে—মানুষকে প্রকৃতি গড়ে তুলেছে একটা বিশেষ লক্ষ্যের, বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আর এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মানুষকে দিয়েছে বিশেষ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। সুতরাং তোমরা যদি স্বাভাবিকতার দোহাই পাও, তা হলে আমি বলতে পারি না, তা স্বাভাবিক নয়—কারণ এই হল প্রকৃতির স্বভাব।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কি লেখেন নি, আমি কি বলি নি—একবার নয়, বহু বহু বার—যে আমরা এখানে রয়েছি অন্যত্র যা করা হয় তারই কেবল ছকে টেনে চলবার জন্যে নয়, তাকেই পাকাপোক্ত করবার জন্য নয়। আমাদের আদর্শটি আমরা আকার দিতে চেয়েছি বিশেষ-ভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে। কারণ, কারো মনঃক্ষুণ্ণ না করে আমি বলতে চাই, যাদের বয়স হয়েছে, জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, অতীতের যথেষ্ট ভারী বোঝা বহন করতে হয়েছে তাদের পক্ষে হঠাৎ জীবনের গতি মনোভাব পরিবর্তন করা বেশ কঠিন—কিন্তু তোমরা যারা ছোট এখনো, যারা তেমন নষ্ট হতে পারে নি—নষ্ট হবার দিন ত পড়েই আছে—সাধারণ শিক্ষার ফলে, পারিবারিক ধরণ-ধারণার ফলে, বংশগত সংস্কারের ফলে—তোমাদের এখনো সুযোগ রয়েছে চেতনাকে নূতন রাস্তায় চালিয়ে দিতে, বাস্তবিক ফল কিছু আয়ত্ত করতে।

সত্যসত্যই আমাদের পরিতাপের কিছু নাই—আমরা জাজ্বল্যমান প্রমাণ পেয়েছি যে আমরা যা করতে চেয়েছি তা করা সম্ভব, যদি ঠিকভাবে তা করা হয়।

আমরা বলি এই কথা। পরিবেশ যদি একই রকম থাকে, শিক্ষা যদি অভিন্ন হয়, সুযোগ যদি সমান থাকে তা হলে যাদের বলা হয় মেয়ে আর পুরুষ তাদের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য দুর্ভেদ্য একান্ত পার্থক্য দেখা দেবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আমরা বলি মানুষ মাত্রই হল এক অভিন্ন আত্মার প্রকাশ। আর প্রকৃতি যদি পার্থক্য এনে দিয়েই থাকে, আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি, তার প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তবুও আমাদের প্রয়োজন আমাদের উদ্দেশ্য যদি অন্যরকমের হয়, প্রাকৃত ব্যবস্থা আমরা যদি স্বীকার করে না নি, তাদেরকে চরম পরম সত্য বলে গ্রহণ না করি তা হলে আমাদের চেতনাকে আমরা অন্যধারায় গড়ে তুলতে পারি।

আমি স্পষ্ট করে বলব, তোমাদেরো স্পষ্ট জানা উচিত, আমরা এখানে অনাত্ম যা চলে তার পুনরাবৃত্তির জন্য নই। আশ্রম কেন? আমাদের "ইউনিভার্সিটি" কেন? সর্বত্র যা করা হয় আমাদেরও সেই একই জিনিষ করবার কি প্রয়োজন? তাদের চেয়ে আমরা সে-কাজ ত বেশি ভাল করে করতে পারব না। তা নয়, বাহিরে যা করা হয়, ঠিক ঐ কারণেই তা আমরা করব না। আর-সকলের মত যদি আমরা করি তবে তা করবার কোনই সার্থকতা নেই। কারণ, আমাদের লক্ষ্যই হল সৃষ্টির মধ্যে নেই এমন একটা জিনিষকে সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে আসা। কিন্তু আমরা যদি জগতের সব প্রাচীন অভ্যাস, সংস্কার, গঠন সযত্নে রক্ষা করে চলি, তবে পুরাতনের খাত থেকে কি রকমে নিষ্কৃতি পাব, কি রকমে গড়ব কিছু?

তোমাদের আমি বারবার বলেছি সবরকম ভঙ্গিতে সুরে: এখানে থেকে যদি বাস্তবিকই লাভবান হতে চাও তা হলে চোখ খুলে দেখ বোঝ নূতন দৃষ্টি দিয়ে নূতন বোধশক্তি দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা হল উর্দ্ধতর, গভীরতর, সত্যতর কিছু, এমন কিছু আজ যা নেই, কিন্তু হবে এক দিন। এই ভবিষ্যৎকে আমরা গড়ে তুলতে চাই বলেই আমরা একটা বিশেষ মনোভাব ধরে চলেছি।

আমি তোমাদের বলেছি, আমরা সত্য পথে যে চলেছি তা প্রমাণও ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি স্থূলভাবে চাক্ষুষভাবে। তবে দুঃখের বিষয় তা স্থায়ী হয়না—সে সব প্রমাণ। কারণ? কারণ, সাধারণ চেতনার মধ্যে নেমে পড়া খুবই সহজ, কিন্তু সিঁড়ির চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা, সেখান থেকে জগৎকে দেখতে থাকা সদাসর্ব্বদার জন্যে, সহজসাধ্য কসরৎ নয়।

কথা তবে এই। প্রকৃতির হুকুম আমরা মানতে বাধ্য নই, থাক না সে হুকুমের পিছনে লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাস। তবে একটা জিনিষ সত্য—প্রকৃতি যে তর্ক তোলে কোন পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে—"কিন্তু চিরকাল যে এ রকম হয়ে এসেছে" এই বলে, সে তর্ক সত্যপ্রতিষ্ঠ নয়। কারণ প্রকৃতি চায় বা না চায়, জিনিষের পরিবর্ত্তন ঘটেই—একদিন

আসবে যখন সকলে বলবে "বাঃ, একদিন মানুষ এ-রকম ছিল, আজ হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য-রকম!"

বর্ত্তমানে আর কিছু না হোক একটু বিশ্বাস একটু নির্ভর রেখে যদি একথা মনে রাখ, যে ঠিক এখনই পরিবর্ত্তনটা চলছে, আমরা একটা সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি যখন অবস্থা ঘুরে, নূতন একটা দিকে চলতে উৎসুক, তবে সবই অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তোমাদের বলা হচ্ছে একটুখানি বিশ্বাস একটুখানি নির্ভর রাখতে, চালকের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে—তা না হলে, এখানে থাকবার কোন অর্থ হয় না। এই আমার কথা।*

* সান্ধ্যসভায় পাঠের অধিবেশনে বালকের কথার সারাংশ।

"ভালোবাসি, সূর্য্যের কিরণ"

বাসরবরণ

ভালোবাসি, সূর্য্যের কিরণ,
ভালোবাসি তার চেয়ে চাঁদিমার আলো,
তার চেয়ে ভালোবাসি তারাদের দ্যুতি ;
সব চেয়ে অন্তরের দীপন প্রভায় ॥

ভালোবাসি, সত্তার শরণ,
ভালো লাগে, মোর মনে ভরে বিশ্বলোক,
তার চেয়ে দীপ্ত হোক্ প্রাণতার স্ফীতি ;
বোধহীন চলে যাই মাটির সভায় ॥

চলে যাবো মাটির সভায় ?
অন্তহীন কাল ধরে মাটিতে ঘুমাবো,
পরম স্নেহের স্পর্শ নিত্য মঞ্জরিবে ;
অকস্মাৎ ছাড়া পাবে প্রাণতার ভাষা ॥

প্রাণ জাগে স্ফীততায় ;
"এখন কেবল আমি বড়ো প্রাণ হবো,
যত পারি তরঙ্গেরে বক্ষপুটে নিবে ;
প্রাণের সমুদ্র হতে, কেবলি এ আশা ॥"

দেখিলাম, ভরে ওঠে প্রাণ ;
"এ যে শুধু সীমা দিয়ে ঘেরিলে আমায়
বিশ্বেরে বুঝিতে দাও একান্ত করিয়া।"
জেগে ওঠে তরিবার একান্ত ক্ষমতা ॥

তরিবার ক্ষমতার দান,
বিশ্বের কতরূপ খুলে দিল। তায়
বাসিলাম, স্পর্শিলাম মানস ভরিয়া,
কাঁদিলাম; একি দিলে বক্ষিয়া পরমতা ?॥

আকুলিত, কত যুগ যায়,
মনের গহন রাজ্যে দিগন্তের জ্যোতি;
অকস্মাৎ চমকিয়া, শুধায় আমারে,
"চাই কিনা দিগন্তের অক্ষুট ঝরণা ?" ॥

বুঝিলাম, কে ডাকে আমায়,
বাসিলাম আকাশের, তারাদের ছাতি
আলোকের আনাগোনা চিত্ততার তারে
তোমার অসীম মাঝে সীমার ধাবনা ॥

MENDEC-2006

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা

পাঠমালা সিরিজ

১।	মা	শ্রীবিদ্যাদ চৌধুরী
২।	চেতনার অবতরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
৩।	শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীঅনিলবরণ রায়
৪।	পঁচিশ প্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ)	নলিনীকান্ত
৫—৭।	মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র বসু
৮-১০।	শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়
১১।	এ-যুগের সাধনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
১২।	কে এই মা ?	শ্রীগুণপতি ভট্টাচার্য

: শ্রীঅরবিন্দ :

বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন খাতাপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

মূল্য ১৲

ভারতের নবজন্ম	১৷৷০
কর্ম্মযোগী	১৷৷০
জগন্নাথের রথ	১৲
গীতার ভূমিকা	২৲
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	১৲
পত্রাবলী	১৷৷০

: শ্রীমা :

উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানি ব্যবসায়ী ও ব্যায়ামী ছ'জনের ছ আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য ১৲

ছোটদের গল্প	১৷৷০
পুরাণো লেখা	১৷৷০
শিক্ষা	১৷৷০
মায়ের আলাপ	২৷৷০

দিব্য-জীবন (ছই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১৪৲